শ্যামাপ্রসাদ-
ব্যর্থ বলিদান?
শান্তনু সিংহ

শ্যামাপ্রসাদ - ব্যর্থ বলিদান ?

শান্তনু সিংহ

অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ
৪৪, বেলদিয়া পাড়া রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৬

SHYAMAPRASAD - BYARTHA BALIDAN ?
by, SANTANU SINGHA

প্রকাশক :
মণীন্দ্র করণ
অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ
৪৪, বেলদিয়া পাড়া রোড
কলকাতা-৭০০ ০০৬

প্রথম প্রকাশ : জুলাই, ১৯৯৪
দ্বিতীয় প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী, ২০১৫
অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ
প্রচ্ছদ : **অসীম দাস**

মুদ্রাকর :
সুনন্দা এন্টারপ্রাইজ
১০/৩৩, বিজয়গড়
কলকাতা-৭০০ ০৩২

৭০ টাকা

তপন কুমার ঘোষ-কে

যাঁর কাছে শিখেছি কলমের সঠিক ব্যবহার

কিছু কথা

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় - নামটা বোধহয় প্রথম শুনেছিলাম আমার পিতৃদেবের কাছে। তখন অবশ্য আমি খুবই ছোট। পরে যখন একটু বড় হয়েছি, বড়দের আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে না পারলেও শুনবার ছাড়পত্র পেয়েছি; দেখতাম শচীন গাঙ্গুলী, স্বর্গত কেশব মজুমদার ও আরো অনেকে প্রায় প্রতি রবিবার আমাদের বাড়িতে আসতেন। আলোচনা জমে উঠত। আলোচনায় মাঝে মাঝেই আসত শ্যামাপ্রসাদের নাম। মনে তখন একটু খটকা লাগত। মানুষটা যদি এত বড়ই হবেন তবে রচনা বইয়ে ওঁর জীবনী নেই কেন? আমাদের পাড়ায় শ্যামাপ্রসাদের জন্মদিন পালিত হয় না কেন?

আরো অনেক পরে - যখন শ্যামাপ্রসাদ মানুষটাকে জানতে চেয়েছি, বুঝতে চেয়েছি তাঁর দর্শন, অনুভব করতে চেয়েছি তাঁর ব্যক্তিত্ব, তখন হন্যে হয়ে খুঁজেও শ্যামাপ্রসাদের উপর লেখা একটা ভালো বইয়ের সন্ধান পাইনি। বোধহয় বলরাজ মাধোক ছাড়া আর কেউ এগিয়ে আসেননি এই মহান ব্যক্তিত্বকে পরবর্তী প্রজন্মের স্মৃতিতে বাঁচিয়ে রাখতে। অকৃতজ্ঞ বাংলা। যে পশ্চিমবাংলার জন্মদাতা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বাঙ্গালী উদ্বাস্তুর মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দিতে যে মানুষটা হেলায় ভুলতে পেরেছিলেন পরিবার পরিজন সবকিছু, তাঁকে বাঁচিয়ে রাখার কোন প্রচেষ্টা বাঙ্গালী করেনি বললেই চলে।

আরো দুঃখের কথা, যাঁরা এখানে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের উত্তরসুরী বলে দাবি করেন, তাঁর বিরাট কাট আউটের নিচে দাঁড়িয়ে এই বিরাট ব্যক্তিত্বের আলোয় নিজেদের উদ্ভাসিত করতে চান, শ্যামাপ্রসাদকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে তাঁরা প্রায় কিছুই করেননি। এ শুধু অভিযোগ নয়, বড় ব্যাথা লাগে ভাবতে।

ব্যাথার এই দংশনই শ্যামাপ্রসাদকে নিয়ে এই লেখা লিখবার প্রধান প্রেরণা। আমার যোগ্যতা সম্পর্কে আমি সচেতন; এই বিরাট মাপের

ব্যক্তিত্বকে নিয়ে আমার মতো এক অতি নগন্য লেখকের লিখতে যাওয়া যে ধৃষ্টতা তা আমি জানি। তবু মনে হল শুরুটা তো হ'ক। মনের এই সাহস লাগাতার জুগিয়ে গেছেন সাংবাদিক পবিত্র কুমার ঘোষ। ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁকে ছোট করতে চাই না।

এই ধরনের গবেষণামূলক কাজ করতে চাই জনবল আর অর্থবল। প্রাক্তন বিদ্যার্থী পরিষদ কর্মী বাদল ভট্টাচার্য্য জুগিয়েছেন আর্থিক সহায়তা। সাহায্য পেয়েছি পশ্চিমবাংলা শাখার অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের কর্মী বন্ধুদের কাছ থেকে। তাঁদের প্রত্যেকের কাছে কৃতজ্ঞ। তবে কয়েকজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যাঁদের সাহায্য ছাড়া এই বই কখনই লেখা সম্ভব হত না; এঁরা হলেন মণীন্দ্র করণ, শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য্য, সমীর পাল, পল্টু দে সরকার ও অরিন্দম মুখার্জী।

বিভিন্ন বই ও পত্র পত্রিকার প্রয়োজনীয় অংশ কপি করে দিয়েছেন সঙ্গীতা চক্রবর্তী। সঙ্গীতাকে ধন্যবাদ।

জ্ঞান প্রকাশনের কর্ণধার জ্ঞানেন্দ্রকুমার রায়কে ধন্যবাদ জানিয়ে কর্তব্য করতে চাইছি না। তাঁর সাহায্য না পেলে এই বই ছাপা হত কিনা সন্দেহ। সময়াভাবে বেশ কিছু ত্রুটি থেকে গেল।

২৭/১বি, বিধান সরণী — শান্তনু সিংহ

কলকাতা-৭০০ ০০৬ — ১৭/০৬/১৯৯৪

-: দ্বিতীয় প্রকাশন :-

১৯৯৪ থেকে ২০১৫। সময়ের ব্যবধান খুব একটা কম নয়। প্রথম প্রকাশন কয়েকদিনের মধ্যে শেষ হয়ে যাবার পরও দ্বিতীয় প্রকাশন বের করা যায়নি - কারণ বিবিধ। একটি ছাত্র সংগঠনের এই গবেষণালব্ধ প্রচেষ্টা প্রমাণ করে, 'অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ' (এ.বি.ভি.পি.) শুধু একটি ছাত্র সংগঠন নয়, একটি ছাত্র আন্দোলনও। এ ব্যাপারে স্যালুট

জানাই এ.বি.ভি.পি.-র বর্তমান নেতৃবৃন্দকে, বিশেষ করে অমিতাভ চক্রবর্তীকে। দ্বিতীয় প্রকাশন চাই, লাগাতার এই দাবী নিয়ে যে তিনজন বইটির দ্বিতীয় প্রকাশকে তরান্বিত করেছেন তাঁরা হলেন বিশ্বজিৎ ধর, শৈবাল ভট্টাচার্য্য ও সুকেশ দেবনাথ। বইটির দ্বিতীয় প্রকাশনের সমস্ত আর্থিক দায়িত্ব স্বেচ্ছায় নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছেন শ্রী দীপক কুমার ভারথুয়ার ও শ্রী পার্থ দত্ত। পার্থ আদ্যপ্রান্ত বামপন্থী। আর দীপকবাবু নির্ভেজাল ব্যবসায়ী। কিন্তু 'শ্যামাপ্রসাদ'-কে নিয়ে বই- এঁদের সমস্ত জড়তা কাটিয়ে দিয়েছে। দিন রাত এক করে বইটিকে আলোর মুখ দেখিয়েছেন শ্রী দীপক দে। অসাধ্যসাধন করেছেন সুনন্দা এন্টারপ্রাইজের কর্ণধার শ্রী সুজিত ঘোষ। এবং সুপর্ণা সিংহ। পাশে থেকে লাগাতার উৎসাহ জুগিয়ে গেছেন। এছাড়া হাজারো নাম না জানা মানুষ, যাঁদের শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে উৎসাহ আমার পাথেয়। শ্যামাপ্রসাদ সম্পর্কে কোন তথ্য জানা থাকলে জানাবেন এই ঠিকানায় -

২৩০/৩, রায়পুর রোড, শান্তনু সিংহ

কলকাতা-৭০০ ০৪৭ ০১/০২/২০১৫

এক নজরে

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

১৯০১ জন্ম কলকাতায়, ৬ই জুলাই

১৯২১ কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজিতে অনার্স সহ প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে বি. এ . ডিগ্রী লাভ।

১৯২৩ প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে ভারতীয় ভাষায় এম.এ. ডিগ্রী লাভ।

১৯২৪ বি. এল. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম। কলকাতা হাইকোর্টে এ্যাডভোকেট রূপে নাম লেখানো। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত। মে মাসে স্যার আশুতোষের মৃত্যুর পর সিন্ডিকেটের শূন্য আসনে সদস্যরূপে মনোনীত।

১৯২৬ ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য বিলাত যাত্রা। লিনকন'স ইন্-এ যোগদান। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় গুলির সম্মেলনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করা।

১৯২৭ বিলেতে ব্যারিস্টার হওয়া।

১৯২৯ বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি নির্বাচিত।

১৯৩০ কংগ্রেস লেজিসলেটিভ কাউন্সিল বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিলে কাউন্সিল থেকে পদত্যাগ এবং স্বতন্ত্র সদস্যরূপে পুনরায় নির্বাচিত।

১৯৩৩ পত্নী বিয়োগ।

১৯৩৪ উপাচার্য - কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পর পর দুইবার, ১৯৩৪-৩৮। কলা ও বিজ্ঞান বিভাগের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কাউন্সিলের সভাপতি - পর পর কয়েক বছরের জন্য। আর্ট ফ্যাকাল্টির ডীন। আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ডের সদস্য ও পরে চেয়ারম্যান।

১৯৩৫ ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সের (বাঙ্গালোর) কোর্ট এবং কাউন্সিলের সদস্য।

১৯৩৭ পুনর্গঠিত কনস্টিটিউশান অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় নির্বাচিত।

১৯৩৮ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডি.লিট. উপাধি প্রাপ্তি। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক এল.এল.ডি. উপাধি প্রাপ্তি। লিগ অফ নেশন্সের "ইনটেলেকচুয়াল কো-অপারশেন কমিটি" তে ভারতের প্রতিনিধি রূপে মনোনীত।

১৯৩৯ অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার কলকাতা অধিবেশনে উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ।

১৯৪০ ১৯৪০-৪৪ এর জন্য অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার কার্যকরী সভাপতি এবং বাংলার হিন্দু মহাসভার সভাপতি।

১৯৪১ ১৯৪১ এর ১১ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৪২ এর ২০শে নভেম্বর পর্যন্ত ফজলুল হকের দ্বিতীয় প্রগতিশীল মোর্চার মন্ত্রিসভায় বাংলার অর্থমন্ত্রীরূপে যোগদান। বিহার সরকার ভাগলপুরে হিন্দু মহাসভার অধিবেশনে নিষেধাজ্ঞা জারী করায়, নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ভাগলপুর অভিযান, গ্রেপ্তার বরণ, ডিফেন্স অফ ইন্ডিয়া আইনে আটক হওয়া, এবং পরে মুক্তি।

১৯৪২ মেদিনীপুরে এবং ১৯৪২ আগষ্ট আন্দোলনের সম্পর্কে অন্যত্র বাংলার গভর্নরের দমননীতির প্রতিবাদে বাংলা মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ। তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগোকে ইঙ্গ-ভারতীয় শাসন ব্যবস্থার প্রস্তাব দিয়ে পত্র লেখা, কারারুদ্ধ মহাত্মাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার প্রচেষ্টা ও অনুমতি না মেলা।

১৯৪৩ বাংলার মন্বন্তরে ব্যাপক সাহায্যের জন্য সংগঠন গড়ে তোলা। অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার অমৃতসর অধিবেশনে সভাপতিত্ব।১৯৪৩-৪৫ বাংলার রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি।

১৯৪৪ "ন্যাশনালিস্ট" নামে এক ইংরাজী দৈনিক সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা করা। অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার বিলাসপুর অধিবেশনে সভাপতিত্ব।

১৯৪৫ নভেম্বরে আজাদ হিন্দ ফৌজ দিবস পালনের সময়ে সরকারের সঙ্গে ছাত্রদের সংঘর্ষের সময়ে ছাত্রদের নেতৃত্বদানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ।

১৯৪৬ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় নির্বাচিত। কলকাতার দাঙ্গায় বিপুল প্রাণক্ষয়। চতুর্দিকে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা। দুর্গত মানুষের পাশে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাবে দাঁড়িয়ে সাহায্যদান। হিন্দুস্থান ন্যাশানাল

গার্ড-এর প্রতিষ্ঠা করা। বাংলা থেকে গণপরিষদে সদস্য নির্বাচিত।

১৯৪৭ পন্ডিত নেহরুর মন্ত্রিসভায় যোগদান এবং শিল্প ও সরবরাহে দপ্তরের ভার গ্রহণ। মহাবোধি সোসাইটির সভাপতি।

১৯৪৯ ভারত সরকারের পক্ষ থেকে পন্ডিত নেহরু কর্তৃক জানুয়ারী মাসে তাঁর হাতে বুদ্ধশিষ্য সারিপুত্তও মোগ্‌গালানার দেহাবশেষ অর্পণ।

১৯৫০ নেহরু-লিয়াকত আলি চুক্তি। পাকিস্তানের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর তোষণ-নীতির ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তীব্র মতপার্থক্য এবং সেই কারণেই ৮ই এপ্রিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ। উদ্বাস্তুদের সেবায় মনপ্রাণ দিয়ে আত্মনিয়োগ।

১৯৫১ পিপল্‌স্ পার্টি নামে একটি নূতন রাজনৈতিক দল গঠন এবং পাকিস্তানকে তোষণের জন্য ভারত সরকারকে অভিযোগ। দিল্লীতে অক্টোবর মাসে ভারতীয় জনসঙ্ঘ নাম একটি সর্বভারতীয় সংগঠনের প্রতিষ্ঠা। লোকসভায় মৌলিক অধিকার খর্বকারী ভারতীয় সংবিধানের সংশোধনী বিল পাস করানোর বিরুদ্ধে লোকসভায় তীব্র প্রতিবাদ জানান।

১৯৫২ সাধারণ নির্বাচনে দক্ষিণ কলকাতা কেন্দ্র থেকে লোকসভায় নির্বাচিত। লোকসভায় জাতীয় গণতান্ত্রিক দল নামে একটি বিরোধী ব্লক তৈরী করেন। নভেম্বর মাসে সাঁচীতে বুদ্ধশিষ্যদের দেহাবশেষ স্থাপনের অনুষ্ঠানে যোগদান। কটক বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব। কানপুরে জনসঙ্ঘের সভাপতিত্ব।

১৯৫৩ জম্মু ও কাশ্মীরের সম্পূর্ণ ভারতভুক্তির জন্য জম্মুতে প্রজা-পরিষদের আন্দোলনে সমর্থন জানানোর জন্য সরকার বিশেষ করে শ্রীনেহরুর সঙ্গে তীব্র বাক্-বিতন্ডা। চাঁদনী চকে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে শোভাযাত্রা করার অভিযোগে গ্রেপ্তার, আটক, পরে হেবিয়াস কর্পাসের আবেদনে সুপ্রীম কোর্টের আদেশে মুক্তিলাভ। ১১ই মে কাশ্মীর প্রবেশ, গ্রেপ্তার এবং শ্রীনগরে আটক থাকা। ২৩শে জুন বন্দীদশায় শ্রীনগরে মৃত্যু। ২৪শে জুন কলকাতায় মহদেহের সৎকার।

বাড়ি থেকে বেরিয়েই বুকটা ছাৎ করে উঠল। 'সূর্যটা মেঘের আড়ালে মুখ লুকিয়ে রেখেছে কেন?' — মেঘলা আকাশের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন দার্শনিক হয়ে গেল হিমাংশু (বাদল) দাশগুপ্ত। কিন্তু মেঘলা আকাশ দেখা তো এই প্রথম নয়। এটা তো জুন মাস। বর্ষাকাল। মেঘ নিয়ে বর্ষা এসেছে আকাশে তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে। প্রায় রোজই তো আকাশ এরকম মেঘলা থাকে। তবে আজ...। অদ্ভুত একটা অস্বস্তি নিয়েই ক্লাবে গেল বাদল। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের জিমনাসিয়াম্ থেকে যখন বাড়ির পথে পা বাড়াল তখনও এই খুঁতখুঁতে অনুভূতিটাই তাকে তাড়া করে ফিরছে।

বাড়ি ফিরেই চমকে উঠল বাদল, ড্রাইংরুমে মাণিক ব্যানার্জী বসে আছে। এরকম অসময়ে তো ও কখনও আসে না। কিন্তু একি চেহারা মাণিকের—লাল চোখ, উস্কোখুস্কো চুল। মাণিকই বাজ ফাটাল ঘরে, —'স্যার নেই।'

'নেই'—মাত্র দু অক্ষরের শব্দটা যে এমন ভয়ঙ্কর কালো মেঘ নিয়ে জগতের সমস্ত আলো শুষে নিতে পারে এর আগে কোনদিন তা উপলব্ধি করতে পারেনি বাদল। মাত্র দু অক্ষরের একটা শব্দ! কিন্তু এত রূঢ়! এত মর্মান্তিক? মৃত্যু এত কঠিন শীততলায় ভরা! বুকের হৃৎপিন্ড নিংড়ে বেরিয়ে আসা কান্নাটা কোন রকমে সামলে নিল সে।

কিন্তু মাণিক কাঁদছে। সমস্ত শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। এই প্রথম মাণিককে কাঁদতে দেখল বাদল। ঢাকার ছেলে। সেখানেই হিন্দু ছাত্র ফেডারেশনের সদস্য ছিল। পরে শ্যামাপ্রসাদের আহ্বানে হিন্দু মহাসভায় যোগ দেয়। শ্যামাপ্রসাদের নির্দেশই মাণিক কলকাতায় চলে আসে। লীগ গুন্ডাদের হাত থেকে হিন্দু মা-বোনের সম্ভ্রম বাঁচাতে শ্যামাপ্রসাদ ক্লাবে যে লাঠি খেলার প্রচলন করেছিলেন মাণিক ছিল তার অন্যতম প্রধান সংগঠক এবং প্রশিক্ষক।

বাদল মাণিককে এতটা অসহায় দেখেনি কখনও। মুগুর ভাঁজা লোহার মতো শক্ত শরীরটার ভেতর এত কোমল একটা মন...! কিন্তু বেশী সময় ভাবতে পারে না সে। এখন কান্নার সময় নয়। এখনই যেতে হবে পার্টি অফিসে। মাণিককে তাড়া লাগায় বাদল। অসহায় দুটো হাত ধীরে ধীরে উঠে আসে বাদলের কাঁধে, ‘‘আমি অনাথ হয়ে গেলাম।’’

শুধু মাণিক নয়, অনাথ হয়ে গেল সমস্ত বাংলা, অনাথ হয়ে গেল সমস্ত ভারত। তাই তো লাখো মানুষের ঢল দেশের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত। রিভলভার উঁচিয়ে রাস্তায় নেমেছে জম্মুর পুলিশ। দাবি একটাই, অপরাধীদের শাস্তি দিতে হবে। লাখো মানুষের মিছিল বেরিয়েছে দিল্লীর বুকে। বেদনার জ্বালা রূপান্তরিত হয়েছে ক্রোদ্ধাগ্নিতে। রক্তের বদলে রক্ত চাই, চোখের বদলে চোখ। পাঞ্জাবে শোকাপ্লুত ক্রুদ্ধ জনতা বিমান বন্দরের দখল নিয়ে নিয়েছে। অজস্র মানুষের বাঁধভাঙ্গা ঢল নেমেছে কলকাতার রাজপথে। শালিমার রেল ইয়ার্ডের শ্রমিকরা তাঁদের বেতন প্রত্যাখ্যান করে চলে এসেছেন মহামিছিলে যোগ দিতে।

জনসঙ্ঘ অফিসে থিক থিক করছে মানুষ। চেনা-অচেনা, জানা-অজানা অসংখ্য মানুষের ভিড় সেখানে। ভিড় জমেছে বৌবাজারে হিন্দু মহাসভার সদর দপ্তরে। উন্মুখ জনতা জানতে চাইছে, যে খবর ‘রটি গেল ক্রমে’ তা সত্যি কি না? বাইরের ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই দেখা হল নরেশচন্দ্র গাঙ্গুলীর সঙ্গে। ফোনে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন দিল্লী অফিসের সাথে যোগাযোগ করার। শেষ আশা, যদি ওরা বলে এই খবর ভুল। পাশেই মাথা নীচু করে বসে আছেন কেশব চক্রবর্তী। সমস্ত অফিসে যেন শ্মশানের নীরবতা, সকলেই নির্বাক বিমূঢ়, বিহ্বল। সবাই উৎকণ্ঠায় বসে আছেন - কি খবর জানাবে দিল্লী অফিস।

কিছুক্ষণ পরেই ফোন ছেড়ে বেরিয়ে এলেন নরেশচন্দ্র গাঙ্গুলী। উৎকণ্ঠিত জনতার দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে চাইলেন। গলা কেঁপে উঠল, ‘‘হ্যাঁ, যে খবর শুনেছেন তা সত্যি। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কাশ্মীরের জেলে মারা গেছেন। বিমানে ওঁর মৃতদেহ কলকাতায় আনা হবে।’’

জনসঙ্ঘ অফিস থেকে দমদমের পথে রওনা হল বাদল। রাস্তায় মানুষের ঢল নেমেছে। বাঁধ-ভাঙ্গা স্রোতের মতো অজস্র মানুষ চলেছে দমদম

বিমানবন্দরের পথে। ঝড়ের বেগে ছড়িয়ে গেছে দুঃসংবাদ। ''বিদ্রোহী বাঙলার ঐতিহ্যবাহক ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাশ্মীর নির্বাসনকালে মৃত্যু হয়েছে।' তাই মানুষ চলেছে প্রিয় নেতাকে শেষবারের মতো শ্রদ্ধা জানাতে। অফিস-আদালত-দোকান বন্ধ করে মানুষ ছুটছে এই মহা মিছিলে যোগ দিতে। এই নিদারুণ শোকে কিভাবে উত্তাল হয়েছিল কলকাতা তা আজও ধরা আছে সেদিনের সংবাদপত্রের পাতায় পাতায় —

''বিদ্রোহী বাংলার ঐতিহ্যবাহক ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাশ্মীরে নির্বাসনকালে মৃত্যু হইয়াছে এই সংবাদ কেবল মুখোপাধ্যায়ের পরিবারের একটি সুন্দর প্রভাতকে ভাঙিয়া দিয়াছে তাহা নহে, কলিকাতার অধিবাসীগণকেও ইহা অসহ্য আঘাতে বিহ্বল করিয়া দিয়াছে।

ডঃ মুখোপাধ্যায়ের অগ্রজ বিচারপতি রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মঙ্গলবার অতি প্রত্যুষে সর্বপ্রথম এই দুঃসংবাদ শ্রবণ করেন। কাশ্মীর হইতে কোন এক সরকারী মুখপাত্র টেলিফোনযোগে জানান যে ডঃ মুখোপাধ্যায় পরলোক গমন করিয়াছেন।

জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনে তখনও এই আঘাত প্রতিধ্বনিত হয় নাই। ডঃ মুখোপাধ্যায় সোমবার শেষ রাত্রে ৩-৪০ মিনিটে মারা যান। কলিকাতায় সম্ভবতঃ মুখোপাধ্যায়ের পরিবারই প্রথম সংবাদ পান। সকাল সাড়ে সাতটায় অল ইন্ডিয়া রেডিওর বাঙলা সংবাদে ইহার কোন উল্লেখ হয় নাই।

সকাল দশ ঘটিকার মধ্যে ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের বাসভবনের সামনে এক বিরাট জনতা সমবেত হয়। ভবনের প্রবেশ পথের সম্মুখে শ্রীনগরে ডঃ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু এবং তাঁহার মৃতদেহ বিমানযোগে কলিকাতায় আনা হইতেছে এই সংবাদ টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

ইহার পর সংবাদপত্রগুলির বিশেষ প্রভাতী সংস্করণ মারফৎ কলিকাতার সমস্ত জনসাধারণ এই নিদারুণ সংবাদ জানিতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার সকল কাজ যেন স্তব্ধ হইয়া যায়। কাহাকেও বলিতে হয় নাই। যাহারা সারাদিনের প্রত্যাশায় সবে বিপনি সাজাইয়াছিল, তাহারা উহা বন্ধ করিয়া দেয় এবং যাহারা বিপনি খুলিতে যাইতেছিল তাহারা তাহা অবরুদ্ধ রাখিয়া ডঃ মুখোপাধ্যায়ের বাসভবনের দিকে যাত্রা করে। দেখিতে দেখিতে সকল

দোকানপাট, বাজার বন্ধ হইয়া যায়। বাস ট্রাম কিছুকাল চলিয়া গতিরুদ্ধ হয়। পায়ে পায়ে হাঁটিয়া দলে দলে অগণিত অসংখ্য লোক ডঃ মুখোপাধ্যায়ের বাসভবনের সম্মুখে সমবেত হইতে থাকে। তাহাদের প্রিয়তম নেতা বাঙালার দুলাল কাশ্মীরে নির্বাসনকালে অকস্মাৎ মারা গিয়াছেন, তিনি এই বাসভবনে জাগ্রত জীবনে আর ফিরিয়া আসিবেন না ইহা জানিয়াও শোকে, আন্তরিক উৎকণ্ঠায় লোক এখানে আসিতে লাগিল। যাহারা পারিল উপরে উঠিয়া আসিল। যাহাদের পক্ষে তাহা দুঃসাধ্য হইল তাহারা দূরে দাঁড়াইয়া এই ভবনের দিকে তাকাইয়া রহিল। এই বিরাট জনতায় ধনী, দরিদ্র, বৃদ্ধ, তরুণ, কিশোর মিশিয়া গিয়াছে। কলিকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তি ও অভিজাতবর্গের মধ্যে কে যে আসেন নাই তাহা বলা কঠিন। অতি সাধারণ অখ্যাতনামা ব্যক্তিরাও কেহ বাদ পড়িয়াছেন কিনা বিপুল জনতার দিকে চাহিয়া তাহাও বলা দুষ্কর। বিপুল জলোচ্ছ্বাসের মতো রাস্তার দুইপ্রান্তে জনপ্রবাহ আছে বটে, কিন্তু গৃহ সম্মুখে জনসমাবেশের-গভীরতা হ্রাস পাইবার লক্ষণ নাই।

অফিস আদালত সবকিছু বন্ধ হইয়া যায়। প্রমোদ অনুষ্ঠান ভবনগুলির দ্বার সারাদিনের জন্যে রুদ্ধ হয়। সারা কলিকাতা এক গভীর শোকচ্ছায়ায় নিমজ্জিত হয়। এইদিন আকাশে একবারও রোদ ফুটিয়া উঠে নাই। সূর্য সারাদিন মেঘাচ্ছন্ন ছিল। প্রকৃতি কাঁদিয়াছে।

ডঃ মুখোপাধ্যায়ের বাসভবনে অনেক বয়স্ক বিশিষ্ট ব্যক্তিও উচ্চস্বরে কাঁদিয়াছেন; অপরিচিত ব্যক্তির চোখে অবিরাম অশ্রু। কেমন করিয়া জনসাধারণের চিত্তে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ এমন দৃঢ়ভাবে আসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন?" (আনন্দবাজার পত্রিকা — ২৪-৬-১৯৫৩)

অসহায়ভাবে বিমান বন্দরের দিকে তাকিয়ে থকে বাদল। সেই দমদম বিমান বন্দর। সেই নিয়নলাইটের আলো। সেই বিমান ওঠানামার একঘেয়ে শব্দ —সবকিছু তেমনি আছে! জড়ের প্রাণ নেই। হিমশীতল মৃত্যুর স্পর্শ অনুভব করার সামর্থ্য নেই জড়ের।

মাত্র দু'মাস আগে এখানে এসেছিল বাদল। হাজার হাজার মানুষ সেদিন জড়ো হয়েছিল দমদম বিমান বন্দরে। এক মহান নেতাকে বিদায় জানাতে। মহৎ এক কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য দিল্লী রওনা হয়েছিলেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ

মুখোপাধ্যায়। বিমান বন্দরে কাঁপিয়ে হাজারো কণ্ঠে স্লোগান উঠেছিল, 'শ্যামাপ্রসাদ তুম্ আগে বারো, হ্যাম্ তুমারা সাথ্ হ্যায়', অভিনন্দন আর সম্বর্ধনায় আপ্লুত শ্যামাপ্রসাদ ঘোষণা করেছিলেন, কাশ্মীর থেকে ফিরে এসেই ঝাঁপিয়ে পড়বেন বাংলার উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধানে। 'ভারত কেশরী শ্যামাপ্রসাদ জিন্দাবাদ' স্লোগানে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল বিমান ওঠা-নামার একঘেয়ে শব্দ। ২৫শে এপ্রিল কলকাতা থেকে দিল্লী উড়ে গিয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ।

আজ ২৩শে জুন। কলকাতায় ফিরে আসছেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তাঁকে যে বিদায় নিতে হবে। অগণিত ছাত্র, শত সহস্র ভক্ত, লক্ষ লক্ষ অনুরাগী আজ চোখের জলের সিঞ্চনে বিদায় জানাবেন তাদের প্রিয় নেতাকে। এ তো মৃত্যু নয়। এ তো মহামরণ। এমন মৃত্যুই তো চেয়েছিলেন ভারতকেশরী। নিজের ডায়েরীতে তাই তো লিখেছেন, 'কিন্তু তিলে তিলে বা ভুগে ভুগে মরতে চাই না, কাজ করতে করতে সংগ্রামের ভিতর যেতে যেতে, সত্যকে বরণ করতে করতে জীবন দীপ নিবে যাক, এই আমার কাম্য।'

নিষ্প্রাণ দেহে নির্বাক কণ্ঠে তিনি আজ গৃহাভিমুখে যাত্রা করেছেন। সমগ্র দেশের বোঝা মাথায় নিয়ে যিনি শুরু করেছিলেন তাঁর যাত্রা, সেই সিংহপুরুষ আজ চির নিদ্রায় শায়িত। যিনি দেশের মানুষের সমস্যার বোঝা যেচে নিয়েছিলেন নিজের কাঁধে, তাঁরই নশ্বর দেহের বোঝা আজ অন্যের কাঁধে।

লক্ষ হাজার মানুষ আজ এসেছে দমদম বিমানবন্দরে। শুধু দমদম বিমানবন্দরে নয়, ভবানীপুর থেকে দমদম বিমানবন্দরের দীর্ঘ পথ আজ মানুষের দখলে। সবাই এসেছে শেষবারের মতো তাদের প্রিয় নেতাকে দেখতে। অন্তিম যাত্রায় শামিল হয়ে শ্রদ্ধা জানাতে। শ্রদ্ধায়, দুঃখে মর্ম্মবেদনায় নির্বাক হয়ে গেছে সবাই। সংবাদপত্রের পাতায় ফুটে উঠেছে সেই ছবি —

"ডঃ মুখোপাধ্যায়ের দেহ বিমানযোগে দমদম পৌঁছিবার কথা। দলে দলে লোক ছুটিল সেখানে। কখন বিমান আসিবে কেউ জানে না, তবুও বেলা ৩টা হইতেই জনস্রোত দমদম অভিমুখে বহিয়া চলিল। বাস নাই, সর্বপ্রকার সাধারণ যানবাহন চলাচল স্থগিত হইয়াছে। তবু অসংখ্য বালক, বৃদ্ধ, যুবা, পুরুষ, রমণী, বাঙালী, অবাঙালী পদব্রজেই চলিয়াছে। সকলেরই গতি দমদমের দিকে।

পথের মোড়ে মোড়ে অগণিত জনতা অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছে তাঁহাদের প্রিয় নেতার অন্তিম যাত্রাকে শেষবারের জন্যে একবার দেখিয়া লইবে।

ডঃ মুখোপাধ্যায়ের দেহ অপরাহ্ন তিন ঘটিকায় দমদম বিমানঘাঁটিতে পৌঁছবে — পূর্বে প্রচারিত এক সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া বেলা দুইটা হইতে কাতারে কাতারে লোক পদব্রজে অথবা যে কোন যানবাহনে পুষ্পমাল্য ও স্তবক বহন করিয়া দমদম অভিমুখে যাইতে থাকে। কলিকাতার কয়েকজন বিশিষ্ট নেতাকেও পুষ্পমাল্য লইয়া দমদম বিমান ঘাঁটিতে অপেক্ষা করিতে দেখা যায়।

অপরাহ্ন তিনটার মধ্যে নরনারী ও শিশুর এক বিরাট জনতা দমদম বিমানঘাঁটিতে সমবেত হয়। তিনটার সময় একখানি বিমান দমদমে অবতরণ করে। উপস্থিত জনতা মনে করে ঐ বিমানে ডঃ মুখোপাধ্যায়ের মৃতদেহ আসিয়াছে। কিন্তু যখন তাহাদেরকে জানানো হয় যে, উহাতে তাঁহার মৃতদেহ নাই তখন তাহারা হতাশ হইয়া পড়ে।

কলিকাতা হইতে দমদম বিমানঘাঁটি পর্যন্ত নয় মাইল দীর্ঘ পথের উভয় পার্শ্বে, গৃহের সম্মুখে ও অলিন্দে এবং পথিপার্শ্বে আগ্রহাকুল জনতা সমবেত হয় এবং দমদমের দিক হইতে আগত প্রত্যেকের নিকট ডঃ মুখোপাধ্যায়ের বিমান কখন আসিবে প্রশ্ন করিতে থাকে।

দমদম প্রত্যাগত সাংবাদিকদের গাড়ীগুলি আটক করিয়া প্রতীক্ষারত জনতা জিজ্ঞাসা করিতে থাকে, শববাহী বিমানের খবর কি আসিল? আসিল কি? তিনটা হইতে ছয়টা, ছয়টা হইতে সাড়ে সাতটা, সাড়ে সাতটা হইতে নয়টা — বিমান আসিবার সময় কেবলই পিছাইয়া যাইতে লাগিল। তথাপি এই বিরাট জনসমুদ্র প্রতীক্ষারত হইতে চ্যুত হইল না।

অবশেষে দেহ দমদমে পৌঁছল।

রাত্রি নয়টা বাজিবার ৫ মিনিট পূর্বে ডঃ মুখোপাধ্যায়ের শবদেহ বহন করিয়া একখানি আই.এন.এ. বিমান দমদম বিমানঘাঁটিতে অবতরণ করে এবং ঠিক নয়টার সময় তাঁহার শবদেহ কলিকাতার মাটি স্পর্শ করে। বেলা ৩টা

হইতেই বিপুল জনতা অশেষ ধৈর্য্য সহকারে প্রতীক্ষা করিতেছিল। জনতার ভীড় এত বেশী হইয়াছিল যে বিমান অবতরণ ক্ষেত্রের প্রবেশপথে পুলিশকে এক কঠিন বেষ্টনী রচনা করিয়া শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে হয়।

বিমানটি অবতরণ করিলে জনতার মধ্য হইতে প্রবল জয়ধ্বনি ওঠে। ডঃ মুখোপাধ্যায়ের তিন ভ্রাতা ও দুইপুত্র বীরভাবে বিমানের ভিতর গমন করেন। ভিতরে ডঃ মুখোপাধ্যায় পুষ্পমাল্য শোভিত হইয়া অন্তিমশয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন। একখানি শাল দ্বারা তাহার দেহ আবৃত ছিল। ডঃ মুখোপাধ্যায়ের ললাটে চন্দন এবং দেহে ইউক্যালিপ্টাস তেল ও অন্যান্য গন্ধদ্রব্য লেপন করিবার পর তাহার দেহটি স্ট্রেচারে করিয়া নামানো হয়।

দমদম বিমানঘাঁটিতে প্রতীক্ষারত জনতা ডঃ মুখোপাধ্যায়ের শবদেহ পুষ্পমাল্য অঞ্জলি দিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

সুসজ্জিত শবাধারের উপর চিরনিদ্রারত ডঃ মুখোপাধ্যায়ের দেহ যখন উঠানো হইতেছিল তখন আর জনতা আপনাকে সম্বরণ করিতে পারে নাই। গভীর শোকাবেশে অভিভূত হইয়া পড়ে।

রাত্রি প্রায় নয়টার সময় দমদম বিমানঘাঁটি হইতে এক বিরাট শোভাযাত্রা ডঃ মুখোপাধ্যায়ের শবানুগমন করিয়া কলিকাতা অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। শোভাযাত্রাটি যতই কলিকাতার নিকটবর্তী হইতে থাকে ততই লোকে লোকে ভরিয়া যাইতে থাকে। পথের দুই ধারে অগণিত লোক, পুরুষ, নারী আবালবৃদ্ধবণিতা আকুল নয়নে ডঃ মুখোপাধ্যায়ের শবদেহের দিকে চাহিয়া থাকে। বাড়ির বারান্দা, গাছের উপর, ছাদে সর্বত্র লক্ষ লক্ষ লোক ডঃ মখোপাধ্যায়কে শেষবারের মতো দর্শন করিবার জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করিয়া থাকে। শ্যামবাজার মোড়ে লক্ষাধিক নরনারী গভীর রাত্রি পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকে।"

মানুষের এই বাঁধনভাঙ্গা হাহাকার জানিয়ে দিচ্ছে মানুষের মনের কত গভীরে প্রবেশ করেছেন শ্যামাপ্রসাদ। বাঙ্গালীর হৃদয়ের প্রতিটি তন্ত্রীতে ধ্বনিত হচ্ছে —শ্যামাপ্রসাদ মরেনি, মরতে পারে না। এ অসম্ভব। সজল চোখে চপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য প্রশ্ন করেছেন, "কেমন করিয়া জনসাধারণের চিত্তে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ এমন দৃঢ়ভাবে আসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন?"

বিদ্যাসাগর—রামমোহন—বিবেকানন্দ-র উত্তরসূরী যে দু'জন বাঙ্গালী তাদের সাবলীল ব্যক্তিত্বের জোরে দেশবাসীর হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করতে পেয়েছিলেন তাঁদের একজন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস, অপরজন ভারতকেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। কিন্তু দু'জনের 'মৃত্যু'ই হয়েছে রহস্যজনকভাবে। তাইহকু বিমানবন্দরে এক বিমান দুর্ঘটনায় 'নিহত' হয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র বোস। এই 'সু-সংবাদ' প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টার কোন কসুর করেননি পন্ডিত নেহরু ও তাঁর দলবল। নেহরুর সরকারই আবার বিশ্বাসযোগ্য করার চেষ্টা করেছে যে শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু হয়েছে স্বাভাবিকভাবে। কিন্তু দেশের মানুষকে ভোলানো যায়নি। প্রশ্ন উঠেছে দেশের কোণে কোণে, "ইহা কি স্বাভাবিক মৃত্যু না রাজনৈতিক অপসারণ, না আরো নগ্ন ভাষায় হত্যা?"

শ্যামাপ্রসাদের মাতা ৮২ বছর বয়স্কা যোগমায়া দেবী তাঁর প্রিয়তম পুত্রের মৃত্যুতে প্রশ্ন করেছেন ডঃ বিধান রায়কে, "কেমন করে ভুলতে পারি যে শ্যামা বিনা চিকিৎসায় মারা গেছে। এই তো বিধান ছিল, সে আমার শ্যামার মতো, বিধান তুমি আছো, আর আমার ছেলে বিনা চিকিৎসায় মারা গেল?"

আনন্দবাজার পত্রিকায় সম্পাদকীয় লেখা হল, "আজ শোকে মুহ্যমান হইয়া বাংলার দুর্ভাগ্য ও বাঙ্গালী সমাজের দুর্ভাগ্য সমস্ত মন দিয়া অনুভব করিয়াছি। সদ্য অতীত ইতিহাসের পটভূমিকায় যেন সেই দুর্ভাগ্যের চিত্ত অন্তর্দৃষ্টির সম্মুখে প্রকট করিয়া দিয়াছে। হায় অভিশপ্ত ভূমি! তোমার নেতৃস্থানীয় সন্তানদের জীবন কোনক্রমে পঞ্চাশের সীমানা অতিক্রম করিতে চাহে না। জীবনের অভিজ্ঞতা ও কর্মের শিক্ষা লইয়া দেশ ও সমাজের হিতার্থে কাজ করিবার সময় যখন আসে, সেই পরিপূর্ণ কর্মপ্রয়াসের মধ্যেই সহসা কর্মচ্ছেদের আহ্বান আসিয়া পড়ে। আজ ডঃ শ্যামাপ্রসাদের জীবনে ত সেই পরিণতি ঘটিল। বাঙ্গালী সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে জীবনের পরিপূর্ণতার পূর্বেই এই যে প্রচণ্ড মৃত্যুস্রোতের আঘাত, ইহা কিভাবে অবরুদ্ধ হইবে অথবা কোন কালে অবরুদ্ধ হইবে কি না তাহা বুঝিয়া পাইতেছি না।"

* * *

পরিচয়ের প্রথম দিনটি মনে পড়ে বাদলের। ১৯৪৬ সালের অগাস্ট

মাসের শেষ দিকের কোন একটা দিন। The Great Calcutta Killing-এর সংগঠিত দাঙ্গা শেষ হয়েছে মাত্র। কিন্তু দাঙ্গার রেশ মিলিয়ে যায়নি। চোরাগোপ্তা আঘাত-প্রত্যাঘাত হেনে চলছে দু'পক্ষ। হিন্দুদের মুসলমান মহল্লায় ঢোকা বন্ধ। মুসলমানরা এড়িয়ে চলছে হিন্দু পাড়া। লীগ গুন্ডাদের আক্রমণ থেকে পাড়া বাঁচাতে অঞ্চলে অঞ্চলে হিন্দু ছেলেরা গড়ে তুলেছে সংগঠন। এমনই এক সংগঠনের নেতা বাদল। কয়েকজন মিলে বোমাও বানাতে শিখছে। ওদের বোমা বাঁধতে শিখিয়েছিলেন জেল থেকে সদ্য মুক্তি পাওয়া বিশ্বনাথ চক্রবর্তী নামে জনৈক 'সন্ত্রাসবাদী' বিপ্লবী। বিশ্বনাথ বাবু একদিন বাদলকে বললেন, "আমি একজনকে তোর কথা বলেছি, তিনি তোকে দেখতে চান। কাল সকালে যাব সেখানে।"

"কোথায়?" প্রশ্ন করেছিল বাদল। কিন্তু উত্তর পায়নি। মৃদু হেসে চলে গিয়েছিলেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। সারা রাত এক অজানা উৎকণ্ঠায় ছটফট করেছিল বাদল।

পরের দিন সকালে ৭৭নং আশুতোষ মুখার্জ্জী রোডের বিরাট বাড়িটায় ঢুকেই চমকে উঠেছিল বাদল। বাড়ির গাড়ি বারান্দায় যে গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে বাংলার প্রতিটি মানুষের তা চেনা। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের গাড়ি। মিনিট পঁচিশ পরে ডাক পড়ল ঘরে। সামনে দাঁড়িয়ে বহু আলোচিত, বহু সমালোচিত, রাশভারী গম্ভীর এক বিরাট ব্যক্তিত্ব। কাঁধে হাত রেখে প্রথমেই প্রশ্ন করলেন শ্যামাপ্রসাদ, "বোমা বানাতে তোমাদের কি কি জিনিসের প্রয়োজন?" একটা মাত্র প্রশ্ন কিন্তু এক ঝটকায় ভেঙ্গে দিল দূরত্বের প্রাচীর। শ্রদ্ধায় মাথা নীচু হয়ে গেল বাদলের। এর আগে শরৎ বোসের কাছে গিয়েছিল বাদল। মুসলীম লীগের আক্রমণ থেকে পাড়া বাঁচানোর আর্জি নিয়ে। ধমক দিয়ে বাদলদের বের করে দিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র বোসের এই দাদাটি। কংগ্রেস নেতা প্রফুল্ল ঘোষের কাছেও গিয়েছিল ওরা। লীগ গুন্ডাদের আক্রমণ থেকে পাড়ার মা-বোনদের সম্মান বাঁচাতে তিনি কিছু উপায় বাৎলে দেবেন এই আশায়। গান্ধীর অহিংসা সুধা আকণ্ঠ পান করার উপদেশ দিয়ে বাদলদের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন বিভক্ত বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী। শ্যামাপ্রসাদ তাঁর ব্যক্তিগত সচিব হরিচরণ ঘোষকে নির্দেশ দিয়েছিলেন বোমা বানানোর

প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ব্যবস্থা করে দিতে। বিস্মিত বাদলের মুখ থেকে বেরিয়ে এল, "আপনি মানুষ নন, ভগবান।"

এই হলেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। বাস্তবকে অস্বীকার করে উট পাখীর মতো বালিতে মাথা গুঁজে মরু ঝড় থেকে বাঁচার প্রয়াস করেননি কখনও। লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সামনে দাঁড়িয়ে শান্তির বাণী আওড়ানো যে আত্মহত্যার সামিল তা জানতেন শ্যামাপ্রসাদ। শুধু 'প্রতিবাদ প্রতিরোধ' নয়, প্রয়োজনে 'প্রতিশোধ' নেওয়ার মানসিকতাও থাকা উচিত বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। তাঁর এই মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় নিজের লেখা রোজনামচায়, "Force must in the last analysis be met with force. An internal policy of non-resistence to armed violence would eventually condemn any Society to dissolution."

তাই '৪৬-এর ১৬ই অগাস্ট মুসলিম লীগের ডাকা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সমর্থনে কম্যুনিস্টরা যখন রাস্তায় নেমেছে; গান্ধীবাদের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকা কংগ্রেসীরা অহিংসা পরম ধর্মের বাণী শোনাচ্ছে; নেহরু দিল্লীতে সরকার গঠন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন; গান্ধী হিন্দু মন্দিরে কোরাণ পাঠ করে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের 'নতুন' ইতিহাস রচনা করছেন; এবং এই অপদার্থতার সুযোগে লীগের গুন্ডা বাহিনী 'কাফের' হিন্দুদের বিরুদ্ধে জেহাদে নেমেছে; তখন লীগের আক্রমণ প্রতিহত করতে রাস্তায় নেমেছিলেন একমাত্র শ্যামাপ্রসাদ। হিন্দু রক্তের নদী বইতে দেওয়ার শপথ নিয়ে রাস্তায় নেমেছিল লীগ। কিন্তু অচিরেই উপলব্ধি হল তাদের যে বন্যায় নদীর দু'কুলই প্লাবিত হয়। জিন্না হুমকি দিয়েছিলেন, 'এবার পিস্তল আছে আমাদের কাছে।' 'পিস্তলের জবাব দেওয়া হবে পিস্তলের ভাষাতেই' শপথ নিয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। শ্যামাপ্রসাদের অন্যতম স্নেহধন্য তরুণ কর্মী সুকুমার ব্যানার্জী ডঃ মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশে চন্দননগর থেকে একটা ভারি সুটকেস বয়ে নিয়ে এসেছিলেন। "কি আছে জানো এর ভেতরে?" ঠোঁটের কোণে হাসি খেলে গিয়েছিল আপাত গম্ভীর মানুষটির। মাথা নেড়েছিলেন সুকুমার ব্যানার্জী। "তুমি নিজের হাতেই সুটকেস খোল," চাবি এগিয়ে দিয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। সুটকেস সাজানো আছে বেশ কয়েকটা পিস্তল। ভারতীয় জনতা পার্টির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি শ্রী সুকুমার ব্যানার্জী নিজমুখে একথা লেখককে বলেছিলেন।

* * *

৪৬-এর কলকাতা দাঙ্গায় লীগের সমস্ত হিসেব-নিকেস উল্টে দিয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। ক্রোধে উন্মাদ, হতাশায় বিপর্যস্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সুরাবর্দী শালীনতার মাথা খেয়ে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্যামাপ্রসাদকে অভিযুক্ত করেছিলেন, " You are a goonda." I "Yes you are right. But you are the leader of the goondas." জবাব দিয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ।

১৯৩৯ সালে শ্যামাপ্রসাদের প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে প্রবেশ। বাংলার রাজনীতিতে তখন ব্যক্তিত্বের বড় অভাব। সুভাষচন্দ্র বোস গান্ধী ও তাঁর সমর্থকদের দ্বারা কোণঠাসা। যদিও তিনি তখন ব-কলমে কংগ্রেস সভাপতি, কিন্তু গান্ধী আশীর্বাদধন্য পন্থ্ প্রস্তাব পাশ হয়ে গেছে। পন্থ্ প্রস্তাবের মূল সুর, যিনি-ই কংগ্রেস সভাপতি হন না কেন, তাঁকে ওয়ার্কিং কমিটি করতে হবে গান্ধীর মত নিয়ে। গান্ধীও দাবী করেছেন, " working committee must be homogeneous whole."

পন্থ্-প্রস্তাব পাশ করেই ক্ষান্ত হল না গান্ধীশিবির। পন্থ্-প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সুভাষ যেন জনমত তৈরী করতে না পারে তার জন্য এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নেওয়া হল। বিষয় নির্বাচনের কয়েকদিন আগে একদিন সন্ধ্যার পর চা পান করার সঙ্গে সঙ্গেই নবনির্বাচিত সভাপতি সুভাষচন্দ্র অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তাঁকে বেশ কিছুদিন থাকতে হল। ফলে পন্থ্-প্রস্তাব পাশের পক্ষে মিথ্যা প্রচার, ভীতি প্রদর্শন প্রভৃতির দ্বারা ভোটদাতাদের নৈতিকভাবে দুর্বল করে দেওয়ার যে প্রচেষ্টা হল সুভাষ তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারলেন না।

গান্ধী কংগ্রেসের রাজনীতির আর একটা দেউলিয়া দিক তখন উন্মোচিত হযে গেছে। মুসলিম লীগের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে কংগ্রেস। বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতের অঙ্গচ্ছেদ করা হল। কিছু মুসলমান বঙ্গিমচন্দ্র রচিত এই প্রেরণাদায়ক সঙ্গীতটির মধ্যে পৌত্তলিকতার গন্ধ খুঁজে পেয়েছে। জাতীয় কংগ্রেস মুসলমান জনমতকে অনুকূলে আনার জন্য এবং কংগ্রেস দলভুক্ত মুসলমান সদস্যদের সন্তুষ্ট করার জন্য বন্দেমাতরমের অঙ্গচ্ছেদ করে ফেলল।

১৯৩৭ সালের নির্বাচন বাংলায় মুসলমান শাসনের নতুন অধ্যায় ধরা যেতে পারে। এর জন্য মুসলিম লীগ যতটা দায়ী তার থেকে বেশী দায়ী গান্ধী

নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস-এর তোষণ নীতি। রাজ্যে লীগ তখন মন্ত্রীসভা গঠন হবার পথে। কলকাতা কর্পোরেশন ও মুসলিম লীগের দখলে।

১৯৩৯ সালে বাংলা প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক পরিষদের স্পীকার স্যার আজিজুল হক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য নিযুক্ত হলেন। ঐ সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমব্লেম 'শ্রী' চিহ্ন খচিত ছিল। মুসলমানরা দাবি করল যে 'শ্রী'র অপসারণ চাই।

ইসলাম বিপন্ন বলে আন্দোলনে নামলেন মুসলমান রাজনীতিবিদ আর তাদের ছাত্রমহল। এর আগেই শ্যামাপ্রসাদ মুসলমানদের বিরাজভাজন হয়েছেন - উর্দ্দু ছাড়া বাংলায় কেন মুসলমানরা ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে পারবেন। 'আল্লা-হু-আকবর' ধ্বনী তুলে শ্যামাপ্রসাদের মুন্ডপাত শুরু হল। সঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরও। হিন্দু (কলকাতা) বিশ্ববিদ্যালয় বয়কট-এর ডাক দেওয়া হল। কেউ কেউ দাবী তুললেন বাংলায় ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। 'শ্যামাপ্রসাদের মুন্ডু চাই' স্লোগান দিয়ে মিছিল বার করল মুসলমান ছাত্ররা। দৈহিক আক্রমণেরও শিকার হলেন শ্যামাপ্রসাদ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য হিসাবে চট্টগ্রাম কলেজ পরিদর্শনে গেলে চট্টগ্রাম স্টেশনেই তাঁকে আক্রমণ করা হল। ট্রেন থেকে নামার মুহূর্ত 'আল্লা-হু-আকবর' ধ্বনি দিয়ে লীগ গুন্ডারা শ্যামাপ্রসাদের মাথায় লক্ষ্য করে লাঠি ছুঁড়ে মারে। কিন্তু লাঠি গিয়ে পরে শ্যামাপ্রসাদের পেছনে থাকা দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক হুমাহুন কবীরের মাথায়। মুসলমান সদস্যরা বঙ্গীয় আইন সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক মঞ্জুরী বন্ধের দাবী তুললেন। অবশেষে অপসারিত হল 'শ্রী' অক্ষর। কংগ্রেস নীরব দর্শক। হিন্দু মহাসভা ছাড়া কেউ এগিয়ে এলো না প্রতিবাদের ভাষা নিয়ে।

কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কি করেননি ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তাঁর চার বছরকাল উপাচার্য থাকাকালীন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে সব সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল তা নিচে দেওয়া হল।

ক) মাতৃভাষার মাধ্যমে ম্যাট্রিকুলেশন স্তরে পঠনপাঠন পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থা

খ) সুসংবদ্ধ বাংলা বানান পদ্ধতি নির্ধারণ

গ) বৈজ্ঞানিক শব্দের পরিভাষা রচনা ও সংকলন

ঘ) প্রাচীন সভ্যতা সংস্কৃতির নিদর্শন সংরক্ষণ, চর্চা ও গবেষণার জন্যে আশুতোষ মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা

ঙ) ভি. এল. মিত্র ফান্ডের শর্তানুসারে মহিলাদের জন্য গার্হ্যস্থ্ বিজ্ঞান পাঠক্রমের সূচনা

চ) ছাত্রদের Social Welfare সম্পর্কে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা; পরে তার সঙ্গে যুক্ত Business Management পাঠক্রম

ছ) ছাত্রদের কর্মসংস্থান সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করতে Information and Employment Board স্থাপন

জ) শিক্ষকদের শিক্ষাদানে দক্ষ করে তুলতে Teachers Training Course-এর প্রবর্তন।

ঝ) ছাত্রদের সামরিক শিক্ষাগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে C.U. Training Course-এর প্রবর্তন। Military Studies-এর ব্যবস্থা

ঞ) ছাত্রদের স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখার জন্য Students Welfare Board স্থাপন

ট) জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা সম্পর্কে সাধারণ পাঠকের জ্ঞাতার্থে বাংলায় ছোট ছোট পুস্তিকা প্রকাশ

ঠ) গ্রন্থাগার ও পাঠাগারের জন্য বিস্তৃত জায়গায় ব্যবস্থা। আশুতোষ বিল্ডিং-এর উপর নতুন একতলা নির্মাণ। গ্রন্থাগারের চার দেয়াল ফ্রেস্কো দ্বারা সজ্জিতকরণ। তাতে ভারতীয় সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ এবং সেক্ষেত্রে বাংলার অবদানের কথা বিশেষভাবে চিত্রিত

ড) ছাত্রদের খেলাধুলা ও ব্যায়াম চর্চার ব্যবস্থা। ঢাকুরিয়া লেক-এ University Rowing Club স্থাপন। University Athletic Club প্রতিষ্ঠা

ঢ) ময়দানে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আলাদা খেলার মাঠের ব্যবস্থা

ন) ফলিত পদার্থ বিদ্যায় 'Communication Engineering' পাঠক্রম চালু করা

ত) চৈনিক ও তিব্বতীয় ভাষা চর্চার ব্যবস্থা

থ) কলেজে I.Sc. Course চালু করা

দ) ম্যাট্রিকুলেশন থেকে এম.এ পর্যন্ত ভূগোল পড়াবার ব্যবস্থা

ধ) কৃষিবিদ্যা অধ্যয়নের ব্যবস্থা

ন) ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বয়সের বাধা প্রত্যাহার

প) মুসলিম ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চার উদ্দেশ্যে Islamic History & Culture বিভাগের পরিকল্পনা

ফ) রবীন্দ্রনাথকে বাংলায় সমাবর্তন ভাষণদানে আহ্বান

ব) বাংলা ভাষায় পি.এইচ.ডি. গবেষণা পত্র দাখিলের অনুমতি প্রদান

ভ) ভারতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীক চিহ্ন পরিবর্তন

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ই প্রথম উপাচার্য যিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন শুরু করেন। ১৯৩৫ সালের আগে পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দিবস পালনের কোন রেওয়াজ ছিল না। কেমন হয়েছিল এই প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন? শ্রী ক্ষেত্রনাথ রায় (ভারতবর্ষ, ফাল্গুন ১৩৪৩) লিখেছেন —

৩০শে জানুয়ারি প্রত্যুষে প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রাঙ্গণে চারি সহস্রাধিক ছাত্র নিজ নিজ বিদ্যামন্দিরে বিশিষ্ট পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া তাহাদের নিজ নিজ কলেজের পতাকা তুলে সমবেত হয়। অতঃপর কলিকাতা নগরীর রাজপথের উপর দিয়া এই বিরাট ছাত্রবাহিনী ধীরগতিতে ময়দান অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। রাজপথের দুইধারে সমবেত জনতা উল্লাস সহকারে তাহাদের শুভদিনের জয়যাত্রাপথে শুভ কামনা জানায়। শোভাযাত্রার পুরোভাগে কলিকাতা আইন কলেজের ছাত্রবৃন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকা বহন করিয়া অগ্রসর হয়। ছাত্রবাহিনী ময়দানে পৌঁছিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যান্ডের ঐকতানের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকা উত্তোলন করা হইলে বেথুন ও আশুতোষ কলেজের কয়েকটি ছাত্রী রবীন্দ্রনাথের রচিত সঙ্গীতটি গাহিয়া সাত সহস্রাধিক নরনারীর প্রাণ পুলকিত করিয়া তোলে।

পুনরায় তিনটার সময় স্থানীয় কয়েকটি স্কুলের বহু ছাত্র ড্রিল প্রভৃতি ব্যায়াম কৌশল প্রদর্শন করে। তাহাদের মধ্যে দর্শকদিগকে আনন্দ দান করে সরস্বতী স্কুলের ছাত্রবৃন্দ। বঙ্গবাসী, ল'কলেজ, ও সিটির 'প্যারালাল বার' ও আশুতোষ

কলেজের ব্রতচারী নৃত্য দেখান হইয়াছিল। ব্রতচারী নৃত্যের প্রবর্তক শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত স্বয়ং ছাত্রদের সহিত নৃত্য করেন। সর্বশেষে ভাইস-চ্যান্সেলার বিভিন্ন বিষয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শনকারী ছাত্রদিগকে 'ইউনিভার্সিটি ব্লু' ও 'প্রশংসা পত্র' বিতরণ করেন। বাঙ্গালার খ্যাতনামা ক্রিকেট খেলোয়াড় এস. ব্যানার্জী-ও 'ব্লু' পাইয়াছেন। সর্বশেষে ভাইস চান্সেলার মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসবের উদ্দেশ্য কি সে বিষয়ে কিছু বলেন।

ইহার পর কুচকাওয়াজ আরম্ভ হয়। সর্বপ্রথম বেথুন কলেজের ছাত্রীরা সভাপতি শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকার সম্মুখ দিয়া কুচকাওয়াজ করিয়া যায়। সেন্ট পলস, শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রেসিডেন্সি কলেজের পরিচ্ছদ ও কুচকাওয়াজ জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের ছাত্ররা সাদা পাজামা পরিধান করিয়া কুচকাওয়াজে যোগ দান করে। মেডিকেল কলেজ গত বৎসরের ন্যায় এবারও কৃতিত্বের সহিত কুচকাওয়াজ করিয়াছে। এ বৎসর সর্বাপেক্ষা বেশি ছাত্র আসিয়াছিল আশুতোষ হইতে। ঐ কলেজের ছাত্রদের পরিধানে ধুতি ছিল। ইউনিভার্সিটির ব্যান্ড ও ব্যাগপাইপ ছাড়া রিপন ও সিটি কলেজের ছাত্ররা ব্যান্ড বাজাইয়া উৎসবকে সাফল্য মন্ডিত করিয়া তুলে। এ বৎসর মফঃস্থল হইতে বিভিন্ন কলেজের বহু ছাত্র উৎসবে যোগদান করে। কুচকাওয়াজ করিবার সময় সকল কলেজের ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকার সম্মুখ দিয়া অগ্রসর হয় ও পতাকা অভিবাদন করে। অতঃপর কুচকাওয়াজ শেষ হলে সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন।

সেদিন ময়দানে সমবেত ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যে ঐতিহাসিক বক্তব্য রেখেছিলেন তার কিছু অংশ এখানে তুলে ধরলাম —

From every corner of this great province there rises today the anxious question, shall we live or shall we die, shall we rise or shall we fall, shall we unite or shall we devide, shall we strive to reconstruct or shall we follow the barren path of destruction. Let me gather in my own the voices of you all who have assembled here today and of those whom you represent and send back the response, we shall live, we shall rise, we shall unite and we shall accept the truth and service as the motto of our lives.

১৯৫০ সালের ৫ই ডিসেম্বর শ্রী অরবিন্দ দেহত্যাগ করলেন। ঠিক হল শ্রী অরবিন্দ-র দর্শন ও মূল্যায়নকে সমাজের মধ্যে আরো বেশী করে ছড়িয়ে দেবার জন্য পন্ডিচেরীতে শ্রী অরবিন্দ নামাঙ্কিত একটি "Cultural Institution" ও একটি বিশ্ববিদ্যালয় হবে। এ ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ কে.এম.মুন্সী। কিন্তু বেঁকে বসলেন নেহরু। তাঁর প্রশ্ন 'So far university centre is concerned, a number of prominent men in India have commended it, but I have failed to find out under whose auspices it will run and who will be responsible for it."

এগিয়ে এলেন শ্যামাপ্রসাদ। ১৯৫১ সালের এপ্রিল মাসে শ্রীমাকে লেখা তাঁর চিঠিটি এরকম "general desire to do what we can to help in continuation of the work started by Sri Aurobindo... we felt that the best memorial would be to establish an international University of Pondicherry which would be an embodiment of all the special features of Sri Aurobindo's life and achievement.

শ্রী অরবিন্দ মেমোরিয়াল গঠিত হল। ১৯৫১-র ২৪-২৫ এপ্রিল তার প্রথম convension। চেয়ারম্যান ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

আশ্রমের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হল 'Sri Aurobindo International University Centre' যা বর্তমানে ' Sri Autobindo International Centre of Education নামে পরিচিত।

শ্রী মনোজ দাসগুপ্ত তাঁর 'a pure & manly life' এ এক অজানা তথ্য জানিয়েছেন 'one evening when the mother came out of the "Interview Room" in play ground... she said that she reposed a great hope on Shyama Prasad but they have killed him.'

* * *

শ্যামাপ্রসাদ '৩৯ সালে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে এলেও রাজনীতি খুব কাছে থেকে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ এসেছিল ১৯৩৭ সালেই। পুনর্গঠিত সংবিধান অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। অতএব খুব ভাল করে দেখতে পেয়েছিলেন কংগ্রেসের আপসনীতি, মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক কর্মকান্ড, গান্ধীর স্বেচ্ছাচার ও কম্যুনিস্টদের বিশ্বাসঘাতকতা। সুতরাং পথ ঠিক হয়ে গিয়েছিল,

শুধু প্রয়োজন ছিল একজন পথপ্রদর্শকের। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দর কাছে অভিষেক হল ভারতকেশরী শ্যামাপ্রসাদের। পরবর্তীকালে শ্যামাপ্রসাদ বলতেন, "আমি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে তিনি (স্বামী প্রণবানন্দ) আমার প্রথম রাজনৈতিক জীবনে বিশেষ প্রেরণা ও শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন। আজিও আমি শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করি এই বিরাট পুরুষের সুমহান ব্যক্তিত্ব, গভীর অন্তর্দৃষ্টি, তেজোব্যঞ্জক পৌরুষ এবং আধ্যাত্মিক শক্তির কথা।"

১৯৩৭ সালে নতুন সংবিধান অনুসারে যে নির্বাচন হয় তার ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা যায়—

বাংলা বিধান সভার মোট সদস্য সংখ্যা —২৫০

(১)	কংগ্রেস	— ৬০
(২)	নির্দলীয় মুসলমান	— ৪১
(৩)	মুসলিম লীগ	—৪০
(৪)	কৃষক-প্রজা পার্টি	— ৩৫
(৫)	ইউরোপীয়	— ২৫
(৬)	নির্দলীয় অনুন্নত শ্রেণীর হিন্দু	— ২৩
(৭)	নির্দলীয় বর্ণহিন্দু	— ১৪
(৮)	নির্দলীয় অতিরিক্ত	— ১২

বাংলা বিধান পরিষদের মোট সভ্য সংখ্যা — ৬৩

(১)	নির্দলীয় মুসলমান	—১৩
(২)	নির্দলীয় হিন্দু	— ১২
(৩)	মুসলিম লীগ	— ১১
(৪)	কংগ্রেস	— ১০
(৫)	ইউরোপীয়	— ৬
(৬)	বিশেষ বিশেষ শ্রেণী	— ১১

কিন্তু নির্বাচনের পর কংগ্রেস এক অদ্ভুত নীতি গ্রহণ করল। স্থির হল যে, যেসব প্রদেশের বিধানসভায় কংগ্রেসের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে শুধুমাত্র সেই সব প্রদেশেই তারা মন্ত্রীসভা গঠন করবে। অর্থাৎ অন্য প্রদেশে বৃহত্তম দল হিসাবে নির্বাচিত হলেও অন্য কোন দলের সাহায্যে তারা মন্ত্রীসভা গঠন করবে না। ফলে বাংলায় ফজলুল হকের কৃষক-প্রজা পার্টির সথে যুক্ত মন্ত্রীসভা গঠনের সুযোগ থাকলেও কংগ্রেস তা গ্রহণ করল না। কিন্তু মুসলিম লীগ সম্পূর্ণ অন্য কৌশল প্রয়োগ করল। তারা স্থির করল যে তাদের রাজনীতি বিস্তারের জন্য তারা যেকোন ভাবে ক্ষমতার অলিন্দে ঢুকবে। অতএব বাংলায় কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠনের উদ্যোগ না নেওয়ায় মুসলিম লীগের তরফ থেকে প্রচেষ্টা চালান হল ফাঁকা মাঠে গোল দেওয়ার। বাংলায় ফজলুল হকের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ — কৃষক-প্রজা পার্টির যুক্ত মন্ত্রীসভা গঠিত হল।

কংগ্রেসের এই হঠকারী রাজনীতির ফল কি হতে চলেছে তা বুঝতে পারলেন সুভাষচন্দ্র বোস। অনুভব করলেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। দুজনেই আপ্রাণ চেষ্টা করলেন যেন ক্ষমতার অলিন্দে মুসলিম লীগের ছায়া না পড়তে পারে। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। আপ্রাণ চেষ্টা করেও সুভাষ এবং শামাপ্রসাদ গান্ধীর মত পরিবর্তন করতে ব্যর্থ হলেন। শ্যামাপ্রসাদের এই অসাধারণ প্রয়াসের স্বীকৃতি দিল ইংরেজ সরকারের গোয়েন্দা দপ্তর -"the government appreciated the endeavours of Hindu Mahasabha to promote unity and lead the country."

কংগ্রেসের যুক্ত মন্ত্রীসভা গঠনের প্রতি অনীহা যতটা ছিল নৈতিক, তার থেকেও বেশী ছিল রাজনৈতিক। গান্ধী শিবিরের একটি গোষ্ঠীর ধারণা ছিল যে বাংলার কংগ্রেসীদের একটা বড় অংশ সহিংস বিপ্লবীদের প্রতি সহানুভূতিশীল। তাঁরা ক্ষমতায় এলে বিপ্লবীদের ছেড়ে দেওয়া হতে পারে।

আবার অন্যদিকে ঘনশ্যাম দাস বিড়লা কোনভাবেই চাইছিলেন না যে বাংলায় হিন্দু-মুসলমানের যৌথ মন্ত্রীসভা ক্ষমতায় আসুক কিংবা কোন সৎ মন্ত্রীসভা এখানে গঠিত হোক। কারণ হিন্দু-মুসলমানের রাজনৈতিক ঐক্য অথবা বাংলার কোন সৎ মন্ত্রীসভার ক্ষমতায় আসা কলকাতায় বাণিজ্য ও অর্থনীতির ব্যাপারে মাড়োয়ারীদের প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ করতে পারে। এই কারণে সুরাবর্দী বা নিজামুদ্দিন ছিলেন মাড়োয়ারীদের অনেক কাছের মানুষ।

মৌলানা আবুল কালম আজাদের চাল ছিল অন্যরকম। তিনি চেয়েছিলেন এই সুযোগে লীগের কিছু সুবিধা করে দিতে। যৌথ মন্ত্রীসভা গঠন না করার কংগ্রেসের এই অদ্ভুত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ১৯৩৮ সালের ২১শে ডিসেম্বর সুভাষচন্দ্র বসু গান্ধীকে যে চিঠি লিখেছিলনে তা এখানে তুলে ধরা হল :

"আপনার চিঠি পাইয়া গভীরভাবে বিচলিত হইলাম (profound shock to me)। বাংলাদেশের মন্ত্রীসভা গঠন সম্বন্ধে বহুবার আপনার সহিত আলোচনা করিয়াছি। কিছুদিন পূর্বে ওযার্ধাতে এ বিষয়টি পুনরায় আমাদের মধ্যে আলোচিত হইয়াছে। আমার দাদা শরৎ বসুও এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করিয়াছেন। আমাদের দুইজনেরই পরিষ্কার মনে আছে যে আপনি বরাবর কংগ্রেস ও কৃষক প্রজাপার্টির যুক্ত মন্ত্রীসভা সমর্থন করিয়াছেন। ওয়ার্ধার সাক্ষাতের পর কি কারণে আপনার মতের এরূপ গুরুতর পরিবর্তন হইয়াছে তাহা জানি না। বেশ বোঝা যাইতেছে যে আজাদ, নলিনী ও বিড়লার সহিত কথাবার্তার ফলেই আপনার মতের এই পরিবর্তন ঘটিয়াছে। তাহা হইলে ব্যাপারটা দাঁড়াইতেছে এই যে যাহাদের উপর বাংলাদেশের কংগ্রেস চালাইবার দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে তাহাদের মতামতের চেয়ে উল্লিখিত তিনজনের মতই আপনার নিকট বেশী মূল্যবান।

আপনার চিঠিতে যে গুরুতর সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে খোলাখুলিভবেই কয়েকটি কথা বলিতে চাই। আসামের বেলায় মৌলানা আজাদ সাহেব এইরূপ যুক্ত মন্ত্রীসভা স্থাপনে আমার বিরোধী ছিলেন এবং সর্দার প্যাটেল আমাকে সমর্থন না করিলে কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতিতে আপনি আমার মত গ্রহণ করিতেন না এবং আসামে যুক্ত মন্ত্রীসভা গঠিত হইত না। সিন্ধু দেশের বেলায়ও মৌলানা সাহেব ছিলেন যুক্ত মন্ত্রীসভার বিপক্ষে এবং আমি ও আর কয়েকজন কার্যকরী সমিতির সদস্য ছিলাম তাহার সপক্ষে। বাংলাদেশের বেলায়ও তাঁহার মত আমার মতের বিরোধী। মৌলানা সাহেব মনে করেন যে, যে প্রদেশে মুসলমান সংখ্যা গরিষ্ঠ সে প্রদেশে সাম্প্রদায়িকতা দোষে দুষ্ট হইলেও মুসলমান মন্ত্রীসভাই রাখিতে হইবে। বেশ বোঝা যাইতেছে যে, সিন্ধু প্রদেশে আল্লা বক্সের মন্ত্রীসভাকে কংগ্রেস সমর্থন করায় মৌলানা সাহেব অসুখী হইয়াছেন।

আমি ইহার ঠিক বিপরীত মত পোষণ করি। আমি মনে করি যে, বাংলাদেশের বর্তমান সাম্প্রদায়িক মন্ত্রীসভাকে যত শীঘ্র সম্ভব দূর করা প্রয়োজন। এই প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রীসভা যতদিন থাকিবে, ততদিনই বাংলায় সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি বাড়িতে থাকিবে এবং মুসলিম লীগের তুলনায় কংগ্রেসের প্রভাব ও প্রতিপত্তি কমিতে থাকিবে। ৯ই ডিসেম্বর আমি কলিকাতা ত্যাগ করিবার পূর্বে নলিনীবাবু বলিয়াছিলেন, তিনি বাজেট সেশনের পূর্বেই পদত্যাগ করিবেন।

এক সপ্তাহের মধ্যেই কেন তাঁহার মতের পরিবর্তন হইল আমি জানি না। মনে হইতেছে যে, তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাও যখন তাঁহার পদত্যাগ বাঞ্ছনীয় মনে করেন তখন আপনার সাহায্যেই তাঁহার মন্ত্রিসভায় টিকিয়া থাকিবার ব্যবস্থা হইতেছে। এই সব গুরুতর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে আপনি আমার সহিত একবার পরামর্শ করাও প্রয়োজন মনে করেন নাই, ইহাতে আমি আশ্চর্য বোধ করিতেছি।"

* * *

১৯৪০ সাল ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস দু'টো সুদূর প্রসারী ঘটনার সাক্ষী। ওই বছর ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় চার বছরের জন্য অখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভার কার্যকরী সভাপতি নির্বাচিত হলেন। আর ওই বছরই লাহোর সম্মেলনে মুসলিম লীগের কুখ্যাত পাকিস্তান প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল।

পাকিস্তান প্রস্তাব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মুসলিম লীগ সভাপতি মহম্মদ আলি জিন্না দাবি করলেন, "ভারতের সমস্যা সম্প্রদায়গত নয়, বরং জাতিগত। এটা খুবই দুঃখের যে হিন্দু বন্ধুরা ইসলাম এবং হিন্দুত্বের স্বরূপ ঠিক বুঝতে পারছেন না। ইসলাম এবং হিন্দুত্ব শুধু আলাদা ধর্ম নয়, সম্পূর্ণ বিপরীত দুই জাতি সত্ত্বা। ... মুসলমানরা সংখ্যালঘু নয়, আলাদা একটা জাতি। জাতি গঠনের সমস্ত প্রয়োজনীয় উপাদান তাদের আছে। তাই তাদের অবশ্যই নিজেদের বাসভূমির অধিকার আছে।"

কম্যুনিস্টরা মহা উৎসাহে জিন্নার বক্তব্যকে সমর্থন করল। সত্যি তো, মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্রের ব্যবস্থা করা উচিত। পার্টি থেকে দাবি করা

ল, "The demand for Muslim self-determination or Pakistan is a just, rogressive and national demand...

ইউটোপিয়ান চিন্তায় মশগুল রইল কংগ্রেস। তাদের মতে, দেশের ধিকাংশ মুসলমান জাতীয়তাবাদী এবং কংগ্রেস সমর্থক। অতএব জিন্নার ভাব মুসলমানদের মধ্যে বিজাতীয় বিদ্বেষ ছড়াতে পারবে না।

লীগের লাহোর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হল একমাত্র ন্দুমহাসভা থেকে। মহাসভার সভাপতি শ্যামাপ্রসাদ তীব্রভাবে ব্যক্ত করলেন ার প্রতিক্রিয়া। বৃটিশ গোয়েন্দা রিপোর্টে বলা হল, " It was only the Hindu lahasabha...reacted sharply against Pakistan Resolution.

আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে মুসলিম লীগ-কৃষক প্রজা পার্টির যৌথ রকার বাংলার ক্ষমতা দখল করেছে। লীগের উদ্দেশ্য ছিল এই সরকারকে াতিয়ার করে সরকারী প্রশাসনযন্ত্রকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের প্রতিপত্তি স্তার করা। লীগের এই প্রতিপত্তি বিস্তারের অবসম্ভাবী ফল হল হিন্দু বিদ্বেষী াম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ১৯৩৯-৪১, এই দু'বছরে বাংলার ৫৪টি বড় সাম্প্রদায়িক াঙ্গা সংগঠিত হল।

এদিকে হকের সাথে জিন্নার মনোমালিন্য শুরু হয়ে গেছে। অবাঙ্গালী সলমানদের স্বার্থে বাংলার স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেওয়া ফজলুক হক মেনে তে পারেননি। জিন্নার প্রভুসুলভ মনোভাবও তাঁর মনঃপুত ছিল না। বশেষে বড়লাটের "National Defence Council"-এ ফজলুল হকের যাগদান উপলক্ষে লীগ-প্রজা পার্টির যৌথ মন্ত্রীসভার পতন ঘটল।

দ্বিতীয়বারের জন্য আর মুসলিম লীগকে সুযোগ দেওয়া হল না। ফজলুল কের নেতৃত্বে একটি প্রগতিশীল মোর্চা বাংলার ক্ষমতায় এল। শ্যামাপ্রসাদ খোপাধ্যায়ের হিন্দু মহাসভা এবং সুভাষ বোসের ফরওয়ার্ড ব্লক ছিল এই মার্চার দুই বড় শরিক। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় হলেন বাংলা সরকারের র্থমন্ত্রী। ফজলুল হক দাবি করলেন যে এই নতুন মন্ত্রীসভাই হল প্রকৃত ন্দু-মুসলমানদের যৌথ মন্ত্রীসভা।

এই মন্ত্রীসভায় শ্যামাপ্রসাদের যোগদান ছিল সম্পূর্ণ আদর্শ প্রসূত। এই সঙ্গে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার যে মন্তব্য করেছেন তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ,

"...ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ফজলুল হকের মন্ত্রীসভায় অর্থ দপ্তরের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। চিত্তরঞ্জন ও সুভাষচন্দ্রের পরেই তখন বাংলার রাজনীতিতে তাঁহার স্থান। তিনি একজন বিচক্ষণ রাজনীতিক ছিলেন — কংগ্রেসের সঙ্গে তিনটি মৌলিক বিষয়ে তাঁহার মতের প্রভেদ ছিল। প্রথমতঃ হিন্দু মুসলমান সম্পর্কিত ব্যাপারে যেমন গান্ধী পরিচালিত কংগ্রেসে মুসলমানদের সম্বন্ধে যে অতিরিক্ত ও অসঙ্গত পক্ষপাতিত্ব ছিল শ্যামাপ্রসাদের তাহা ছিল না। তিনি হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে অপক্ষপাত ব্যবহার দাবি করিতেন। যে কোন প্রকারেই হউক মুসলমানদের তুষ্টি বিধান পূর্বক তাহাদের সহযোগিতা লাভ করিতে হইবে, নচেৎ ভারতের মুক্তিসংগ্রাম সফল হইবে না, গান্ধী ও তাঁহার অনুগত কংগ্রেসের এই নীতির তিনি প্রতিবাদ করিতেন। দ্বিতীয়তঃ কংগ্রেসের মতো তিনি প্রাদেশিক শাসনের নতুন আইন (১৯৩৩) একেবারে তুচ্ছ বলিয়া অগ্রাহ্য করেন নাই। ... তৃতীয়তঃ, তিনি জানিতেন মুসলিম লীগ হিন্দু স্বার্থের বিরোধী এবং বাংলাদেশের রাজ্য শাসনে তাহাদের আধিপত্য বা প্রভাব হিন্দুর পক্ষে অনিষ্টকর। সুতরাং তিনি ফজলুল হকের আমন্ত্রণে মন্ত্রীপদ গ্রহণ করিলেন। ইহার বোধহয় আর একটি কারণ ছিল। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ বাড়াইয়া বৃটিশ আধিপত্য বজায় রাখার জন্য গর্ভমেন্ট মুসলিম লীগের রাজনীতিক প্রভাব বাড়াইতে সচেষ্ট ছিলেন। এই জন্যই তাঁহারা অপেক্ষাকৃত অসাম্প্রদায়িক মনোভাবসম্পন্ন ফজলুল হকের পরিবর্তে মুসলিম লীগের প্রভাব ও ক্ষমতা যাহাতে বাড়ে তাহার জন্য সর্বদাই চেষ্টা করিতেন। সুতরাং ফজলুল হকের নেতৃত্বে বাংলার মন্ত্রীসভা যাহাতে মুসলিম লীগের ষড়যন্ত্রে ক্ষমতাচ্যুত না হয় এই জন্য শ্যামাপ্রসাদ তাঁহার সহিত যোগ দিলেন।"

ঐ সময় ইংরেজ সরকারের পক্ষ থেকে War-cabinet-এর কথা ঘোষণা করা হল। হিন্দু মহাসভা War-cabinet-এর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। মহাসভা থেকে বলা হল যে মাতৃভূমি বিভাজনের বিন্দুমাত্র ইঙ্গিত আছে এমন কোন প্রস্তাব তারা মেনে নেবে না। কংগ্রেস পড়ল দোটানায়। ক্যাবিনেটের প্রস্তাব সমর্থন করার অর্থ ছিল সাম্প্রদায়িক রাজনীতি প্রত্যক্ষভাবে মেনে নেওয়া। অন্যদিকে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের অর্থ হল মুসলমান সম্প্রদায়ের বিদ্বেষ কুড়ানো। কিন্তু ইতিমধ্যে কংগ্রেস তার মুসলমান ভজা রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িক

সম্প্রীতির নামে দেশবিরোধী কার্যকলাপের জন্য সমস্ত দেশে, বিশেষ করে বাংলায় জমি হারাতে শুরু করেছে। অন্যদিকে শ্যামাপ্রসাদের positive রাজনীতি দেশের মানুষের সমর্থন পেতে শুরু করেছে। বৃটিশ গোয়েন্দা দপ্তরের রিপোর্ট অনুযায়ী "...definitely the Congress in Bengal has lost considerable prestige which has been gained by Hindu Mahasabha and it was more due to the strenuous effort of Dr. Shyama Prasad Mookherjee." অতএব নৈতিক না হলেও রাজনৈতিক কারণেই কংগ্রেস War-cabinet-এর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হল। কিন্তু কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্ত ছিল শুধুই রাজনৈতিক চাল। শ্যামাপ্রসাদ এবং তার হিন্দু মহাসভার ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা রুখতে কংগ্রেস যে নীতিহীন রাজনীতির আশ্রয় নিয়েছিল তা বোঝা গেল কিছুদিনের মধ্যেই। কংগ্রেসের তরফ থেকে রাজাগোপালাচারী দেশভাগের পক্ষে অযাচিতভাবে এক সূত্র (For mula) পেশ করে বসলেন। এই কুখ্যাত C. R. Formula গান্ধীর আশীর্বাদ পেল নাটকীয়ভাবে।

এবারও প্রতিবাদের প্রথম সারিতে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও তাঁর হিন্দু মহাসভা। ঐ সময় ঠিক হয়েছিল যে ইংরেজ প্রভুদের তাঁর সূত্র বোঝাতে রাজাগোপালাচারী যাবেন সেখানেই তাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাবে হিন্দু মহাসভা।

১৯৪০ সালেই মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সোচ্চার আন্দোলন শুরু করেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। লীগের দেশভাগের প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে রাস্তায় নামিয়ে এনেছিলেন সংগঠনকে। হিন্দু মহাসভার তরফ থেকে 'Anti Communal Award Day' পালন করা হল সারা দেশে। ঢাকার কর্পোরেশন ময়দানে এক বিশাল জনসভায় শ্যামাপ্রসাদ দেশবাসীকে ডাক দিলেন ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য — মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতি এবং কংগ্রেসের আত্মমর্যাদাহীন আত্মসমর্পণ নীতির বিরুদ্ধে।

১৯৪২ সালে হিন্দু মহাসভার লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে শ্যামাপ্রসাদ ঘোষণা করলেন যে মুসলমানদের খুশী করার জন্য কংগ্রেস দেশ বিরোধী (anti national) যে কার্যকলাপে লিপ্ত হয়েছে হিন্দু মহাসভা শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও তা রুখবে।

অমৃতসরে হিন্দু মহাসভার সর্বভারতীয় সমাবেশে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যে ভাষণ দিয়েছিলেন কংগ্রেস নেতৃত্ব তা মেনে নিলে পরবর্তীকালে হয়তো দেশভাগের অভিশাপ এড়ানো যেত। তিনি দাবি করলেন, "দেশপ্রেম কখনও খোলা বাজারে নিলাম ডেকে খরিদ করা যায় না। ভারতবর্ষের অধিকাংশ মানুষের মুখপাত্র কংগ্রেস যদি জাতীয় ঐক্য এবং আত্মমর্যাদার মতো মৌলিক বিষয়গুলি বিকিয়ে দিয়েও মুসলিম লীগের সমর্থন চায়, তবে সরকার আরো চড়া দাম দিয়ে লীগের সমর্থন আদায় করতে চাইবে, যেন কোন ভাবেই দেশের এই দুই বৃহৎ সম্প্রদায় ঐক্যবদ্ধ হতে না পারে। রাজনৈতিক কারণে দেশটাকে টুকরো টুকরো করার উদ্দেশ্যেই বৃটিশ সরকার লীগকে দেশের অধিকাংশ মুসলমানের মুখপাত্র হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। আমরা শুধু রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কারণেই এর বিরোধিতা করছি না। হিন্দু কখনও মাতৃভূমির বিভাজন সহ্য করতে পারবে না। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকেও এই বিভাজন ভারতবর্ষের পক্ষে এক ভয়ঙ্কর সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। এটা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিতে হবে যে পাকিস্তান দাবির উপর ভিত্তি করে মুসলিম লীগের সঙ্গে কোন আলোচনা হতে পারে না।"

কিন্তু ধর্মের কাহিনী শুনবে কে? ১৯৪৪ সালে জেল থেকে বেরিয়েই গান্ধী ঘোষণা করলেন যে তিনি মুসলিম লীগ সভাপতি মহম্মদ আলি জিন্নার সঙ্গে আলোচনায় বসবেন। প্রমাদ গণলেন শ্যামাপ্রসাদ। আলোচনার নামে গান্ধী যে জিন্নার কাছে অপমানজনক আত্মসমর্পণ করবেন এ ব্যাপারে স্থির নিশ্চিন্ত ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। কিন্তু সেইসময় বাংলায় লীগের সমর্থন তলানিতে এসে ঠেকেছে। শ্যামাপ্রসাদ গান্ধীকে অনুরোধ করলেন যে তিনি যেন লীগের এই দুরবস্থায় জিন্নাকে গুরুত্ব দিয়ে মুসলিম লীগের পরিত্রাতার ভূমিকা পালন না করেন। প্রয়োজনে গান্ধীর বিরুদ্ধে আন্দোলনের হুমকি দিলেন শ্যামাপ্রসাদ। সরকারের গোপন নথীতে লিপিবদ্ধ হল "It seems clear that Shyama Prasad Mookherjee put his case very strongly to Gandhi and did not mince matters. Former is the most determined character who will stick at nothing and I shall say he will get a good deal of support from many Congressmen, especially in Bengal. One report states that he reminded Gandhi that he had said on one occasion that indivisibility of India is his God and 'Vivisect me before you vivisect India."

১৯শে জুলাই, ১৯৪৪, শ্যামাপ্রসাদ গান্ধীকে একটি চিঠি লিখলেন।

সেখানে বারবার অনুরোধ জানানো হল যেন কোনভাবেই গান্ধী মাতৃভূমির অঙ্গচ্ছেদ মেনে না নেন। শ্যামাপ্রসাদ লিখলেন, "সত্যি বলতে কি, রাজাগোপালচারী জিন্নার কাছে যে সূত্র (Formula) দিয়েছেন তাতে আমি বিচলিত হয়ে উঠেছি। আমরা হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সমাধানে আগ্রহী। কিন্তু রাজাগোপালাচারী যেভাবে বিষয়টির ইতি টানতে চাইছেন আমরা তার সাথে একমত নই। আপনার পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে জিন্না কোন সমাধনে আগ্রহী নন। তিনি নিজেকে ভারতীয় বলে মনে করেন না এবং যে স্বাধীনতার জন্য প্রজন্মের পর প্রজন্ম আত্মাহুতি দিচ্ছে তাতে তাঁর কোন আগ্রহ নেই। বাংলা এবং ভারতের যে কোন ধরনের বিভাজন আমরা তীব্রভাবে ঘৃণা করি। ... আমরা আপনাকে কংগ্রেস থেকে আলাদা মনে করি, কিন্তু এই বিষয়ে আপনার অঙ্গীকার আমাদের প্রচন্ড অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে ফেলেছে। আমাদের ভয় জিন্না এই প্রস্তাবকে Spring board হিসাবে ব্যবহার করবেন এবং হিন্দুস্তান ভাগ ও পাকিস্তান গঠনের কাজে এই Spring board কে কাজে লাগাবেন। ফলে আরো বেশী বিশৃঙ্খলা ও অব্যবস্থার সৃষ্টি হবে। ....জিন্নাকে খুশী করা যাবে না, কারণ তিনি এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান চান না। মাঝখান থেকে আপনার এই অনুমোদন ভবিষ্যতের জন্য সমস্যার সৃষ্টি করবে। আপনার প্রস্তাব পুনরায় ভেবে দেখার জন্য আমি আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি। মাত্র কয়েকদিন আগে আপনি নিজেই হরিজন পত্রিকায় লিখেছেন যে দেশভাগের যে কোন চিন্তা-ভাবনা আমাদের মধ্যে নতুন ধরনের বিবাদ এবং বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করবে।

"আমার মনে হয়, আপনার পরিষ্কার করে বলা উচিত যে দেশের স্বাধীনতা কেবলমাত্র সমস্ত রাজনৈতিক দল এবং সম্প্রদায়ের ঐক্যবদ্ধ সহযোগিতাতেই পাওয়া সম্ভব। যারা সমগ্র দেশের স্বাধীনতা চায় তাদের এই আন্দোলনে যোগ দিতে আহ্বান জানানো হোক। অনেক মুসলমানও আজ বুঝতে পেরেছে যে পাকিস্তান অবাস্তব চিন্তা-ভাবনা। বৃটিশ সরকারও জিন্নার উপর ভরসা হারিয়ে ফেলেছে। ঠিক এইরকম একটা সময় আপনি জিন্নাকে তুলে ধরতে চাইছেন যেন কেবলমাত্র জিন্নাই দেশের মুসলমানদের ভাল করতে পারেন। যে মুসলমানরা লীগের রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না এবং জাতীয় আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে চায় তাদের কাছে এটা অবশ্যই একটা বড় আঘাত।

"...আপনি জানিয়েছেন যে, আপনি যখন আপনার শর্ত নিয়ে আলোচনা করবেন তখন একজন ভারতীয় হিসাবেই এই আলোচনা করবেন, হিন্দু হিসাবে নয়। নিশ্চয়ই। কিন্তু একজন ভারতীয় হিসাবে আপনি যখন শুধু মুসলমানদের দাবি নিয়েই চিন্তা ভাবনা করেন এবং এই ব্যাপারে জিন্নাকেও তোষণ করতে প্রস্তুত, তখন আমিও একজন ভারতীয় হিসাবে হিন্দুদের ন্যায্য অধিকার ও দাবির কথা তুলে ধরতে পারব না কেন? যদি একজন ভারতীয় হিসাবেই; আপনি আপনার পরিচয় দিতে চান, তবে আমার অনুরোধ, একজন ভারতীয় হিসাবে কেবলমাত্র ভারতীয়দের কথাই চিন্তা করুন।"

'ভারতীয়' হিসাবে গান্ধী জিন্নার সাথে দেখা করেই ক্ষান্ত হলেন না, দেশভাগের পক্ষেও তাঁর সম্মতি জানিয়ে এলেন। ক্ষুব্ধ, দুঃখিত, বেদনাহত ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর রোজনামচায় মন্তব্য করলেন, "মুসলিম লীগের প্রতিপত্তি শুধু ইংরেজ পোষণে বাড়েনি — কংগ্রেস ও তার নেতৃবৃন্দ অনেক সময় লীগের আবদার সহ্য করেছেন, তাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন, জিন্নার পায়ের তলায় গান্ধীজি প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা লুটিয়ে পড়েছেন। এই সর্বনেশে তোষণ-নীতির ফলে লীগের শক্তি আরো বেড়ে উঠেছে, ...আমি দিল্লী থেকে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ঘুরে এলাম। দেখলাম একটা হিন্দু জাগরণের সাড়া পড়েছে। পাকিস্তানের সঙ্গে আপোস যে অবাস্তব তা সবাই বুঝেছেন। কিন্তু কংগ্রেসের নেতারাও এই কথা বলতে শুরু করায় সাধারণ লোকেরা হিন্দুসভার বিশেষ প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে উদাসীন হয়ে উঠেছিল। Congress খুব বড় একটা ধাপ্পার ভিতর আশ্রয় নিয়েছিল। তারা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কিন্তু তারা self-determination for territorial unity মানতে প্রস্তুত এবং কাউকে তারা জোর করে ভারতে রাখতে চায় না। জিন্না সাহেব তো স্ব-ইচ্ছায় ধরা দিতে রাজী নন — তিনি স্পষ্ট-ই বলেছেন যে তিনি ভারতের কতকটা অংশে মুসলিমরাজ গড়তে চান। কংগ্রেস আত্মনিয়ন্ত্রণ হিসাবে পুরো sind, N.W.F. এবং আধা Punjab এবং Bengal দিতে রাজী — অর্থাৎ যেসব অঞ্চলে মুসলমান খুব বেশী, সেখানে সবাই যদি মিলিতভাবে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায় Congress তাতে বাধা দেবে না। আমরা এর ঘোর প্রতিবাদ করি। তা হলে দেশকে যে টুকরো করা যাবে — এটা মানা হল।"

* * *

'স্যার, একটু বিশ্রাম না নিলে আপনি অসুস্থ হয়ে পড়বেন।' সকাল থেকে ঘুরে ঘুরে শ্রান্ত ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্য উদ্বেগ জানিয়েছিল বাদল।

'বিশ্রাম', হেসেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। 'শেষ বিশ্রামের আগে আর বিশ্রাম নেওয়া সম্ভব নয়।'

জনাকয়েক কর্মী নিয়ে সকাল বেলায় বেরিয়ে পড়েছেন শ্যামাপ্রসাদ। ট্রাম ডিপোগুলি তাঁর লক্ষ্য। ট্রাম ডিপোগুলিতে গিয়ে ড্রাইভার কন্ডাক্টারদের বোঝাচ্ছেন পরদিন হরতালের গুরুত্ব।

সংগঠন নেই, নেই সংগঠিত লোকবল। কিন্তু আছে বাংলার জন্য ভাল কিছু করার প্রেরণা, আছে হিমালয়ের মতো দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি, আছে দেশের মানুষের জন্য বুকভরা ভালোবাসা, আর আছে দেশের মানুষের সমর্থন।

কেন্দ্রীয় সরকার ঠিক করেছিল যে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের সদর দপ্তর কলকাতা থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। গর্জে উঠেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। বাঙ্গালীকে এইভাবে ভাতে মারার প্রতিবাদে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। বাংলা জুড়ে হরতালের ডাক দেওয়া হয়েছিল।

কম্যুনিষ্টরাও এই হরতাল সমর্থন করেছিল। সমর্থন না করে উপায়ও ছিল না। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদকে হেয় করার জন্য চক্রান্ত শুরু করেছিল ওরা। ট্রাম কোম্পানির কর্মচারী ইউনিয়নগুলি ছিল কম্যুনিস্টদের। গোপনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে হরতালের দিন ভোরবেলা ট্রাম চালানো হবে কলকাতার বুকে। এতে বে-ইজ্জত হবেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। কিন্তু কিভাবে যেন এই চক্রান্তের খবর জানতে পেয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। তাই ট্রাম ডিপোগুলিতে ঘুরে ঘুরে কর্মচারীদের বুঝিয়েছিলেন, অন্ততঃ একদিনের জন্য হলেও পার্টির উর্দ্ধে উঠতে হবে সকলকে - বাংলার স্বার্থে, বাঙ্গালীর স্বার্থে। হরতাল সর্বাত্মক হয়েছিল। বিকালে শহীদ মিনারের পদদেশে যে সর্বদলীয় সভা অনুষ্ঠিত হল স্বাভাবিক কারণে তার প্রধান বক্তা শ্যামাপ্রসাদ।

বাংলার জন্য তথা দেশের জন্য ভালোবাসার এই প্রেরণা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ পেয়েছিলেন তাঁর পিতৃদেব বাংলার বাঘ আশুতোষ মুখার্জীর কাছ থেকে।

সিংহসম ব্যক্তিত্ব, তেজোদীপ্ত পৌরুষ, ভিসুভিয়াসের মতো তেজ, দেশের মানুষের জন্য হৃদয় উজাড় করা ভালোবাসা, দেশকে মাতৃরূপে পূজা করার ভক্তি - সবকিছুতেই ভারতকেশরী ছিলেন বাংলার বাঘের যোগ্য উত্তরাধিকারী।

আশুতোষ মুখার্জী না থাকলে সুভাষচন্দ্র বোস কোনদিনই আই.সি.এস. হতে পারতেন কি না সন্দেহ। ওটন সাহেবকে ঘুষি মেরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন সুভাষ। ইংরেজ শাসনে এক সাহেবের মুখে ঘুষি মারা! তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আশুতোষ মুখার্জী। তিনি সুভাষকে ডেকে পাঠালেন। স্কটিশ চার্চ কলেজে সুভাষের ভর্ত্তির ব্যবস্থা হল। স্নাতক হলেন সুভষচন্দ্র বোস।

বাংলার জেলগুলিতে যে সমস্ত যুবকরা বন্দী ছিলেন তাদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। শুধু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বা বাংলার প্রগতিশীল মন্ত্রীসভার অর্থমন্ত্রী হিসাবে নয়। ব্যক্তিগত উদ্যোগও তিনি নিয়েছিলেন যেন জেল বন্দী বাঙ্গালী যুবকরা জেলে বসেই তাদের লেখাপড়া শেষ করতে পারে। এমনও দিন গেছে যখন নিজের মাহিনা থেকে বরাদ্দ করতেন বইয়ের টাকা। এখন যেখানে মনীষা গ্রন্থালয়, তখন সেখানে ছিল City Book নামে একটি বইয়ের দোকান। জেলে যুবকদের কাছে পাঠ্য বই যেত ঐ দোকান থেকে। একথা আমাকে বলেছিলেন প্রয়াত সাংবাদিক পবিত্রকুমার ঘোষ।

বাংলার প্রতি শ্যামাপ্রসাদের দরদ ছিল অকৃত্রিম। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বাংলাকে কখনও সুনজরে দেখে না। বাঙ্গালীর ত্যাগ, আত্মসমর্পণ না করার নীতি, লড়াই করার প্রবণতা অন্যদের চোখে ভাল ঠেকেনি। সুভাষ-গান্ধীর বিরোধ তো সর্বজনবিদিত। আসলে বাংলা ছিল এক ব্যতিক্রম। বাংলা থেকেই প্রশ্ন উঠেছিল গান্ধীর মহত্ব নিয়ে। বাংলাই সন্দেহ প্রকাশ করেছে নেহরুর নৈতিকতার প্রশ্নে। তাই কংগ্রেস নেতৃত্ব চিরদিন চেয়েছে বাংলাকে দূরে সরিয়ে রাখতে, বাঙালীকে সংস্কৃতির দিক থেকে শেষ করে দিতে। বাঙ্গালী বিদ্বেষী কোন এক সাংসদ একবার কটু মন্তব্য করেছিলেন বাংলাকে নিয়ে। গর্জে উঠেছিলেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ। "মনে রাখবেন, জামার নীচে লুকিয়ে রাখা দাগটা এখনও মুছে যায়নি।" অর্থাৎ বাঁকে মাল টেনে

.বড়ানো কুলিগিরি করা যাদের পেশা তারা কি বুঝবে বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথের
াংলা।

শ্যামাপ্রসাদ ভালো হিন্দী জানতেন না। গান্ধী তাঁর এই দুর্বলতার কথা
ানতেন। সেই সময় শ্যামাপ্রসাদ অসুস্থ। গান্ধী এসেছেন কলকাতায়।
্যামাপ্রসাদের কুশল কামনা করে হিন্দীতে একটি চিঠি লেখেন গান্ধী। জবাব
দিয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ, তবে বাংলায়।

একবার ক্যাবিনেট বৈঠকে শ্যামাপ্রসাদকে দেখে মন্তব্য করেছিলেন নেহরু,
'কমার্স ডিপার্টমেন্টটা তো পশ্চিমবঙ্গ বানিয়ে ফেললেন।" উত্তর প্রস্তুত ছিল।
্যামাপ্রসাদ জবাব দিলেন, "ঠিকই, তবে এই ব্যাপারে আমি রাজাজীকে
অনুসরণ করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করি।" রাজা গোপালাচারী ও
অন্যান্য দক্ষিণী মন্ত্রীরা তাঁদের দপ্তরগুলি দক্ষিণের লোক দিয়ে ভর্ত্তি করে
ফেলেছিলেন।

আগেই আলোচনা করা হয়েছে, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ফজললু
হকের দ্বিতীয় মন্ত্রীসভায় অর্থমন্ত্রী হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু কিছুদিন
মন্ত্রীপদে থেকেই বুঝতে পারলেন, যে আশা নিয়ে তিনি সরকারে যোগ
দিয়েছিলেন তা বাস্তবায়িত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। আই. সি. এস.
কর্মচারীরা ছিল উদ্ধত এবং গভর্ণরের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করে
নিজেদের মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ থাকার ফলে তারা মন্ত্রীদের কাজে
বাধার সৃষ্টি করত। নতুন সংবিধানে গভর্ণরের হাতে বিশেষ ক্ষমতা থাকায়
তিনিও মন্ত্রীর নির্দেশ অমান্য করে সেক্রেটারির মতামতই গুরুত্ব দিতেন।
শ্যামাপ্রসাদ বুঝতে পারলেন গভর্ণর নিজে এইসব আই. সি. এস. কর্মচারীদের
সহযোগিতায় মুসলিম লীগকে বাংলায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করতে চাইছেন।
গভর্ণরের এই ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করে ১৯৪২ সালের ২৬শে জুলাই
তিনি গভর্ণর জন হাবার্টকে একটি সুদীর্ঘ চিঠি লেখেন :-

"It is an open secret that the Hindu and Muslim combination in
Bengal under Mr. Fazlul Haq's leadership was not welcomed by a
section of permanent officials." চিঠিতে এই অভিযোগ করে তিনি
লেখেন, "আমাদের প্রায়ই শোনান হয় যে, হিন্দু ও মুসলমান নেতারা একসাথে
শাসনকার্য পরিচালনায় ব্যর্থ হওয়ায় ভারতের রাজনৈতিক অগ্রগতি ব্যাহত

হচ্ছে। বৃটিশ অধিকৃত ভারতের ইতিহাসে এই বাংলাদেশেই সর্বপ্রথম নিজ নিজ সম্প্রদায়ের উপর প্রচুর প্রভাবশালী হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধির যে গণতান্ত্রিক সংবিধান তাদের দেওয়া হয়েছে তাতে প্রচুর ত্রুটি ও অপূর্ণতা থাকা সত্ত্বেও তা কার্যকরী করার চেষ্টা করছে। এই পরীক্ষা সার্থকতা অর্জন করলে তা স্বাভাবিকভাবে 'সাম্প্রদায়িক বিরোধের জন্যই ভারতের রাজনৈতিক অগ্রগতি হচ্ছে না', এই অজুহাতকে মিথ্যা বলে প্রমাণ করবে। সরকারী আমলাতন্ত্র আপ্রাণ চাইছে যেন এই পরীক্ষা ব্যর্থ হয়।"

গভর্ণরের ব্যবহারের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করে তিনি অভিযোগ করেন, "ফজলুল হক ও তাঁর সহকর্মীদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়ার পরিবর্তে আপনি সময়ে অসময়ে মুসলিম লীগের পক্ষে ওকালতি করাই প্রয়োজনীয় মনে করেছেন। সত্যি বলতে কি, মুসলিম লীগের হয়ে এই বিশেষ ওকালতি আমাদের চোখে আপনাকে একজন নিয়মতান্ত্রিক প্রধান অপেক্ষা মুসলিম লীগের একজন বিশিষ্ট রাজনৈতিক রীতিনীতির পরিচালক হিসেবেই প্রতিভাত করেছে এবং আমাদের কাছে আপনার আচরণ রহস্যজনক বলে মনে হয়েছে। গভীর দুঃখের বিষয় এই যে, জনগণের দাবি ও অধিকার-সম্পর্কীয় গুরুতর ব্যাপারেও আপনি আপনার নিয়মতান্ত্রিক পরামর্শদাতাদের পরিবর্তে এক শ্রেণীর স্থায়ী কর্মচারীদের দ্বারা পরিচালিত হতে দিচ্ছেন।....আপনি এই প্রদেশে শাসনতন্ত্রের মধ্যে আর একটি শাসনতন্ত্রকে কার্যকরী করেছেন। সেখানে আসল ক্ষমতা এমন সব লোকের হাতে চলে গেছে যাদের এই প্রদেশে জন-মতানুযায়ী নিয়মতান্ত্রিক শাসন পরিচালনা করার কোন দায়িত্ব নেই। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ। অতএব আপনার জানা প্রয়োজন যে আপনি জ্ঞানত অথবা অজ্ঞানত আপনার মন্ত্রীদের মধ্যে এমন এক ধারণার সৃষ্টি করেছেন যা এই প্রদেশে সৎভাবে শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বলা বাহুল্য, শ্যামাপ্রসাদের এই চিঠিতে সরকারী মনোভাব ও কার্যপদ্ধতির কোনরকম পরিবর্তন হয়নি। বরং গভর্ণর শ্যামাপ্রসাদকে জানালেন যে 'বর্তমান সংবিধান অনুসারে তাঁর প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করা সম্ভব নয়'। এই চিঠি পেয়েই শ্যামাপ্রসাদ বুঝতে পারেন যে আত্মমর্যাদা রেখে তার পক্ষে মন্ত্রী থাকা সম্ভব নয়। মন্ত্রী হিসাবে তিনি দেশের কোন উপকারেও লাগতে পারবেন না।

তবুও শেষ চেষ্টা হিসাবে তিনি ১৯৪২ সালের ১২ই আগষ্ট বড়লাট লর্ড লিনলিথগোকে চিঠি লিখে অবিলম্বে ভারতকে স্বাধীনতা দিতে অনুরোধ করেন। তিনি ঐ চিঠিতে আরো দাবী করেন যে "ইংরেজ ভারত ছাড়" একটি "জাতীয় দাবী।"

চিঠির উপসংহারে শ্যামাপ্রসাদ লেখেন যে, "যদি আপনিও মনে করেন যে, বৃটিশ সরকার আর বেশী দূর অগ্রসর হবে না, এবং তারা এই কোণঠাসা অবস্থা চলতে দেবে, তবে স্বাধীনতার এই দাবির অনুকূলে জনমত গঠনের কাজে আত্মোৎসর্গ করার জন্য আমি গভর্ণরের কাছে আমাকে মন্ত্রীত্ব পদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেবার জন্য অনুরোধ করছি।" এর কিছুদিন পরই ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ফজলুল হক মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেন।

শ্যামাপ্রসাদ তাঁর পদত্যাগপত্রে কি লিখেছিলেন তা সেদিন জানা যায়নি। কারণ ভারত রক্ষা আইন অনুসারে তার প্রকাশ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। তবে ১৯৪৩ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী তিনি বঙ্গীয় আইন পরিষদে তাঁর পদত্যাগের কারণ সম্বন্ধে যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তা থেকে এর কিছু আভাস পাওয়া যায়। ঐ বিবৃতিতে তিনি বলেন যে স্থায়ী ইংরেজ কর্মচারীদের ঔদ্ধত্য এবং গভর্ণরের তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে মন্ত্রীসভা পরিচালনার ক্ষেত্রে যে সংকটের সৃষ্টি হয়েছে কোন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে এই পরিস্থিতিতে মন্ত্রীপদে থাকা সম্ভব নয়। তাছাড়া ১৯৪২ সালের আন্দোলন দমনের জন্য গভর্ণরের পৃষ্ঠপোষকতায় আমলাতন্ত্র মেদিনীপুরে ও অন্যান্য স্থানে যে সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছে এবং মেদিনীপুরে সাইক্লোন বিধ্বস্ত মানুষকে তাদের রাজদ্রোহের অপরাধে শাস্তি স্বরূপ কোনরকম সাহায্য না দিয়ে নিশ্চিন্ত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে তার উল্লেখ করে তিনি গভীর দুঃখের সঙ্গে বলেন যে কুটচক্রী আমলাতন্ত্রের উদ্ধত কর্মচারীদের অপচেষ্টার ফলে মন্ত্রীরা এই অত্যাচারিত আর্ত মানুষকে কোন রকম সাহায্য করতে পারেনি।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৯৪২ সালের অগাষ্ট মাসে সারা ভারতে যে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন হয়েছিল তার মধ্যে বাংলার মেদিনীপুর জেলার অধিবাসীরা শীর্ষস্থান অধিকার করে। অগাস্ট বিপ্লব মেদিনীপুর জেলায় গণ বিপ্লবের রূপ নেয়। এই গণ-বিপ্লব দমন করতে সরকারও গণহত্যা ও

গণধর্ষণের সাহায্য নেয়।

মেদিনীপুরে সরকারের অত্যাচার সম্পর্কে বাংলার গভর্ণর ও মন্ত্রীসভা সম্পূর্ণভাবে উদাসীন ছিল। মন্ত্রীদের মধ্যে একমাত্র শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এর তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন, মেদিনীপুরে সরকার যেভাবে অত্যাচার করছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান জাতি - ইংরেজদের বর্ণনা অনুসারে - অধিকৃত প্রদেশে যে অত্যাচার করেছিল কেবল তার সাথেই তুলনা করা যেতে পারে। পুলিশ ও সৈন্যরা শত শত ঘড় বাড়ি পুড়িয়েছে এবং নারী ধর্ষণ করেছে।"

কিন্তু বর্বরতা ও রাজকর্মচারীদের নৃশংসতা এখানেই শেষ হয়নি। ঐ সময় মেদিনীপুরে এক প্রবল ঝড় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ঐ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে প্রায় দশ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়। গবাদি পশুর তিন-চতুর্থাংশ নিহত হয় এবং প্রায় এক লক্ষ বাড়ি ধ্বংস হয়। সেই নিদারণ রাতেও মহকুমা হাকিম কার্ফু তুলে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিপর্যস্ত মানুষদের নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাওয়ার সুযোগ দেননি। যারা কোনরকমে জীবন রক্ষা করেছিল তাদের ত্রাণের জন্য নৌকা চলাচলের অনুমতি দেওয়া হয়নি। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ব্যবস্থাপক সভায় বলেছিলেন (১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩) "জেলা শাসক মেদিনীপুরের বিদ্রোহীদের প্রতি বিরাগ ও বিদ্বেষবশত লোকের কষ্ট লাঘব করার জন্য একজন দায়িত্বশীল কর্মচারীর যা অবশ্য কর্তব্য তা পালন করতেও বিরত ছিলেন। এমনকি, তিনি (জেলা শাসক) রাজ্য সরকারকে লিখে জানিয়েছিলেন যে মেদিনীপুরের মানুষেরা সরকারের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন করেছে তার শাস্তি স্বরূপ সরকার কোনরকম ত্রাণ কার্য চালাবে না এবং কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকেও ত্রাণ কার্য চালাতে অনুমতি দেবে না।"

সরকারের এই অমানবিক দৃষ্টিভঙ্গির চ্যালেঞ্জ হিসাবে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় Bengal Cyclone Relief Committee গড়ে তোলেন। তিনি নিজেই এর সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। কোষাধ্যক্ষ হিসাবে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং সম্পাদক হিসাবে অধ্যাপক সতীশ চন্দ্র ঘোষ কার্যভার গ্রহণ করেন। এর আগে অবশ্য মেদিনীপুরের বিদ্রোহীদের সাহায্য করার জন্য তিনি Sufferers' Relief Committee গঠন করেছিলেন। এভাবে শ্যামাপ্রসাদ দুদিক থেকে মেদিনীপুরের মানুষকে সাহায্য করতে লাগলেন। একদিকে দুর্গত

মানুষদের কাছে সাহায্য নিয়ে যাওয়া, অন্য দিকে সরকারী অত্যাচার ও অবহেলার নমুনা জগৎবাসীর সামনে তুলে ধরা। বাংলার গভর্ণরের গোপন রিপোর্টেও উল্লেখ করা হল, "Since his resignation Dr. Mookherjee has devoted himself to exploiting the situation in Medinapore in a manner, calculated to discredit His Excellency the Governor and government officials."

ঐ সময় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হককে যে চিঠিটি লিখেছিলেন, ঐতিহাসকি কিন্তু দুর্লভ ঐ চিঠিটি এখানে তুলে দেওয়া হল।

17th January 1943.

My dear Chief Minister,

Harrowing tales of loot and destruction of properties of civil population and outrage of ladies in certain villages within Mahisadal P. S. in Tamluk, have reached us from various independent sources. These incidents took place on Saturday, the 9th of January last. It is alleged that about one hundred and fifty armed men (it is not clear if these were members of troops or of armed police force surrounded in the morning the villages of Masuria, Chak Gazipur, Chandipur and Lakhya in Union No. 11, Mahisadal P, S. They divided themselves into various groups and posted themselves at different points on the main road leading to different villages as also in bushes near about.

Then they carried on searching enquiries into individual houses, forcibly removed the menfolk under arrest and detained them at various places till afternoon. It is alleged these detained persons were severely beaten and some were rendered senseless.

Meanwhile, some of these armed men re-entered into the houses of these villagers, committed outrage on a large number of ladies, destroyed the belongings and decamped with cash and valuables.

I have in my possession written statement of some of the sufferers, including ladies, giving most pathetic descriptions of the incident. The crimes alleged to have been committed were brutal revolting and unprovoked.

It is essential that there should be an immediate investigation

so that the guilty men may be adequately dealt with and proper steps be taken to avoid recurrence of such incidents. As you are aware, in such cases panic-stricken people are afraid of giving full information unless they are guaranteed protection. I would request you to visit the place of occurrence yourself or at least to depute one of the Ministers, who should be accompanied by one or two leading non-official gentlemen. .There are feeling of great resentment and consternation among the local people some of whom have seen me personally. Action should be immediately taken to protect life and honour of peaceful citizens in areas already greatly affected by acts of both men and nature.

Yours sincerely
Sd/- Shyama Prasad Mookherjee

The Hon'ble Mr. A. K. Fazlul Haq,
Chief Minister, Government of Bengal.

ফজলুল হকের যুক্ত মন্ত্রীসভার কাজকর্মের উপর ইংরেজ সরকার আদৌ সন্তুষ্ট ছিল না তা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। বড়লাট লর্ড লিনলিথগোর কাছে পাঠানো বাংলার গভর্ণর জন হারবার্টের পাঠানো এক গোপন চিঠিতে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। 'I am not satisfied with Haq's attitude. He also seemed reluctant to issue statement or to carry out counter propaganda against Gandhi's movement. Nor am I altogether happy about the attitude of Mahasabha.'

ইংরেজ, মুসলিম লীগ ও মারোয়াড়ী ব্যবসায়ীদের চক্রান্তে ২৮শে মার্চ, ১৯৪৩ ফজলুল হক মন্ত্রীসভার পতন ঘটল। নতুন মন্ত্রীসভা গড়লেন লীগ নেতা নাজিমুদ্দীন। নাজিমুদ্দীনের শাসনকালের কলঙ্কজনক প্রধান ঘটনা ১৯৪৩ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ, যা চল্লিশের মন্বন্তর হিসাবে পরিচিত হয়ে আছে। সরকারী হিসাবেই এই দুর্ভিক্ষে অনাহারে মৃতের সংখ্যা দশ লক্ষ। বেসরকারী মতে প্রায় পনের লক্ষ মানুষ অনাহারে মারা গিয়েছিল। সরকারী অপদার্থতা ছিল এই দুর্ভিক্ষের মূল কারণ।

স্বাভাবিকভাবেই বাংলার দুর্ভিক্ষপীড়িত অনাহারক্লিষ্ট মানুষকে বাঁচাতে এগিয়ে এলেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। সরকারী সাহায্যের উপর ভরসা না রেখে তিনি 'Bengal Relief Committee' গড়ে তুললেন। এখানে উল্লেখ্য যে মহাসভার নাম তিনি এই ত্রাণ ও সেবা কার্যের সাথে জুড়তে চাননি।

রাজনীতির উর্দ্ধে থেকে আর্ত মানুষের ক্ষুধার অন্ন জোটানোই ছিল তাঁর একমাত্র ব্রত। "The only party that stood out to view and treat problem (famine) on humanitarian ground and keep it beyond the purview of political gain was the Bengal Hindu Mahasabha in the person of Dr. Shyama Prosad Mookherjee."

কিন্তু জাতির এইরকম একটা দুঃসময়েও কংগ্রেস তার ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিল না। মুসলিম লীগের তরফ থেকে শুধুমাত্র দুর্ভিক্ষপীড়িত মুসলমান জনসাধারণকে সেবা করার কথা ঘোষণা করা হল। কংগ্রেসের তরফ থেকে লীগের ত্রাণ তহবিলে সাহায্য দিতে জনসাধারণকে অনুরোধ করা হল। কংগ্রেস নেতা জি. ডি. বিড়লা নিজে মুসলিম লীগের ত্রাণ তহবিলে প্রচুর অর্থ দান করলেন।

স্বভাবতই শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের উপর চাপ সৃষ্টি হতে লাগল। বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রশ্ন উঠতে লাগল যে 'Bengal Relief Committee' -র সমস্ত কাজ যদি হিন্দু মহাসভাকেই করতে হয় তবে মহাসভার নাম দিতে আপত্তি কোথায়? অনেকেই দাবি করলেন যে নিজেদের বিশ্বাসযোগ্যতা এই সময় প্রমাণের যে সুযোগ পাওয়া গেল তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা উচিত। অনেক ভাবনা চিন্তার পর 'Bengal Relief Committee' 'Hindu Mahasabha Relief Committee' তে রূপান্তরিত হল।

বাংলার এই দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের সাহায্যের জন্য তিনি সেদিন সংসদে সমস্ত সাংসদদের প্রতি যে আবেদন জানিয়েছিলেন তা থেকে মানবতাবাদী শ্যামাপ্রসাদকে চিনে নেওয়া যায়। সাংসদদের কাছে তিনি আবেদন করেন যে, 'We get now Rs. 40 per day. I do not know what the allowance of the members of the House of People will be hereafter. Let us agree to a voluntary cut of Rs. 10 per day and let us set apart this sum for the purpose of opening homes where these women and children may be housed and fed." কিন্তু দুঃখজনকভাবে সাংসদদের শ্যামাপ্রসাদের ডাকে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসতে দেখা যায়নি।

১৯৪৪ এর ৩০শে জুন পর্যন্ত হিন্দুমহাসভা ত্রাণ কমিটির ফান্ডে ৮,৫৪,৬৪২ টাকা ১৬ পয়সা জমা পড়ে। এছাড়া ৩৫,৬৭৬ মন চাল ও ডাল এই ত্রাণ কমিটির ভান্ডারে সংগৃহীত হয়। এর থেকে ৭,০৭,১৮৬ টাকা ৬৪ পয়সা

চাল ও ডাল কেনার জন্য খরচ করা হয়। ৭০,৪৩৪ টাকা ১০ পয়সা খরচ করা হয় জামা কাপড় ও কম্বল কিনতে। ৯,৪৪০ টাকা খরচ হয় সূতা কিনতে এবং বাকী ১৬,০০০ টাকা লাগে ওষুধের জন্য। ২৪টি জেলার ২২৭টি ত্রাণ কেন্দ্রের থেকে প্রতিদিন গড়ে ১,৯৭,৭২৭ জনকে এই সাহায্য দেওয়া হয়েছিল। এছাড়াও ঐ ত্রাণ কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে ১৬,৬৪০টি ধুতি, ১০,৫৮৩টি শাড়ি, ৩,৯২৪টি গেঞ্জি এবং ৯,৭৮৯টি বাচ্চাদের পোশাক জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল। ইতিহাসের পরিহাস, ঠিক ঐ সময় কম্যুনিস্ট পার্টির তরফ থেকে যুদ্ধরত মিত্রবাহিনীকে খাদ্যশস্য পাঠানোর জন্য প্রচার করা হচ্ছিল।

যাই হোক, ঐ সময় আবার বাংলার মুসলিম লীগ সরকার ধান সংগ্রহের ব্যবস্থা করলে হিন্দু মহাসভা ব্যাপক আন্দোলন শুরু করে।

১৯৪৩ সালের ২০ এবং ২৪ সেপ্টেম্বর কলকাতায় মহাসভার তরফ থেকে বিক্ষোভ সংগঠিত করা হয়। সেখানে 'খাদ্য চাই - খাদ্য দাও', 'অপদার্থ লীগ সরকার নিপাত যাক' প্রভৃতি স্লোগানে প্রতিবাদী ভুখা মানুষ তাদের ক্ষোভ ব্যক্ত করে। সরকার শ্যামাপ্রসাদের সমস্ত বক্তব্য সেন্সর করে। সরকারী নীতির তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বাংলা বিধান পরিষদে শ্যামাপ্রসাদ দাবি করেন যে 'Political maladministation lies at the roof of the present catastrophe. No lasting solution can come until India is economically and politically free.' স্বাভাবিকভাবে শ্যামাপ্রসাদের এই ভূমিকা সরকারের অপছন্দ হলো। বৃটিশ সরকার তার গোপন রিপোর্টে স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে প্রয়োজনীয় মুহূর্তে কংগ্রেস 'did little' এবং হিন্দু মহাসভা 'did much' এবং ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় "is perhaps the one man who is working for the relief of the distress without sparing himself the least bit."

দুর্ভিক্ষের বাস্তব চিত্র তুলে ধরার জন্য শ্যামাপ্রসাদ নিজেই 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' নামে একটি বই লেখেন। বইটির 'প্রতিকারের উপায়' অধ্যায়টির কিছু অংশ এখানে তুলে ধরা হল-

"পঞ্চাশের মন্বন্তর দৈব দুর্ঘটনা-প্রসূত নয়। বন্যা ও বাত্যার ফলে কয়েকটি জেলায় শস্যহানি হইয়াছে সত্য, কিন্তু সারা বাংলা জুড়িয়া যে নিদারুণ

বীভৎসতা দেখা দিয়াছে, তাহার কারণ অন্যবিধ। নিন্দাবাদ বা দোষ দেখানো এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। বৃটিশ সরকার এখনও ভারতের প্রভুত্ব দাবি করেন, আমি চাই, তাঁহাদের উদ্যোগে একটি রয়্যাল কমিশন গঠিত হউক। নিরপেক্ষ বিচক্ষণ ব্যক্তিরা ঐ কমিশনের সদস্য হইয়া দুর্ভিক্ষের মূল কারণ অনুসন্ধান করিবেন। তখন ধরা পড়িবে, আমলাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় কত গলদ, কত অনাচার ও অযোগ্যতা। বৃটিশ সরকারের যে প্রতিনিধিদের হাতে আসল ক্ষমতা ন্যস্ত রহিয়াছে, তাঁহাদের দায়িত্বজ্ঞানশূন্যতাও ইহা হইলে প্রকাশ হইয়া পড়িবে। বোঝা যাইবে, প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসনের শূন্যগর্ভতা। একদিকে মন্ত্রিমন্ডলী - তাঁহাদের দায়িত্ব আছে প্রচুর, কিন্তু ক্ষমতা নাই। অপর দিকে লাটসাহেব ও আমলাচক্র - তাঁহারা সর্বশক্তিমান, কিন্তু দায়িত্বের কোন বালাই নাই। বাদ-প্রতিবাদ পরস্পরের প্রতি দোষারোপ অনেকই হইয়াছে। যদি সত্য নির্ণয় করিতে হয়, তাহা হইলে অনুসন্ধানের ভার দিতে হইবে এমন সব সুযোগ্য ব্যক্তির উপর যাঁহারা শ্রদ্ধার্হ, দেশবাসী যাঁহাদের উপর পূর্ণ আস্তাশীল।

বাংলাকে বাঁচাইবার জন্য আমরা আবেদন করিয়াছিলাম। তাহার ফলে ভারতের প্রতি অঞ্চলে ধারণাতীত সাড়া জাগিয়াছে। সর্বশ্রেণীর মানুষের নিকট হইতে স্বত্বঃস্ফূর্ত সাহায্য-ধারা আসিতেছে। বাঙালির হৃদয় ইহা গভীরভাবে স্পর্শ করিয়াছে। কিন্তু আমি বারম্বার বলিয়াছি, শুধু জনসাধারণের চেষ্টায় সঙ্কটের অবসান হইতে পারে না। গভর্ণমেন্টের সর্বপ্রধান কাজ, দেশবাসীর খাদ্য যোগানো, এই কর্তব্য পালনে গভর্ণমেন্টকে বাধ্য করিতে হইবে।

আমাদের চেষ্টার ফলে অন্তত দুইটি কাজ হইয়াছে। প্রথমত, বাংলা ও অপারপর প্রদেশে, এমন কি ভারতের বাহিরেও - জনমত গড়িয়া উঠিয়াছে। খবর চাপা দেওয়া এবং অবস্থা লঘু করিয়া দেখানোর যথেষ্ট চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু সত্য গোপন থাকে নাই। সমগ্র সভ্য জগতের দৃষ্টি আজ বাংলার উপর পড়িয়াছে। ভারতের বৃটিশ শাসনের ফলাফল লইয়া দেশ-বিদেশে তিক্ত সমালোচনা হইতেছে।

দ্বিতীয়ত, এ যাবত প্রচেষ্টা অতি সামান্যই হইতেছিল। শুধু এই বুলি শুনিয়া অসিতেছিলাম, ঘরে ঘরে অজস্র খাদ্যসম্ভার গোপনে সঞ্চিত হইয়া আছে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির সাহায্য চেষ্টায় মন্ত্রিমন্ডলীর এখন সুর

বদলাইয়াছে। লোভী ব্যবসাদার ও সঞ্চয়ী গৃহস্থের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া আর দায় মিটিবে না, সরকারের চোখ ফুটাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, দেশবাসীকে বাঁচাইবার প্রধান দায়িত্ব তাঁহাদেরই। গভর্ণমেন্টের তরফ হইতে আজ অবধি খুব যে বেশি কাজ হইয়াছে তাহা নয়। তবে লাভ হইয়াছে, সারা বিশ্বের কাছে কর্তৃপক্ষকে অবিরত জবাবদিহি করিতে হইতেছে। জনগণকে শাসন করিবার যাঁহারা দাবি রাখেন, জনগণের জীবনরক্ষার দায়িত্ব হইতে তাঁহারা কিছুতেই অব্যাহতি পাইবেন না।

বাংলার সমস্যা আজ বড় নিদারুণ। কেবল অন্নসত্র খুলিয়া ইহার সমাধান হইবে না। পল্লী অঞ্চলে খাদ্য একেবারে অমিল। পেটের জ্বালায় ও দুর্দশার তাড়নায় মানুষ গ্রাম ছাড়িয়া দলে দলে শহরে আসিতেছে। আশা, শহরে আসিলে খাদ্য পাইবে। মৃত ও মুমূর্ষুর সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে। লক্ষ লক্ষ নরনারী জীবনীশক্তির শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে - ইহাদের মধ্যে মধ্যবিত্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারেরাও আছেন। অবিলম্বে প্রতিকার না হইলে ইহারা একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবেন।

মানুষ ঘরবাড়ি ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িতেছে। ছন্নছাড়া হইয়া কে কোথায় ছিটকাইয়া পড়িতেছে, ঠিক নাই। গোষ্ঠীবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো দ্রুত ভাঙিয়া পড়িতেছে।

রুগ্ন কঙ্কালসার শিশুগুলি বাংলার ভবিষ্যৎ শঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি যত দ্রুত সম্ভব সাহায্যের ব্যবস্থা করিতেছে। স্থানীয় লোকজনের মধ্যেও তাহারা অনুপ্রেরণা জাগাইয়াছে। কিন্তু খাদ্যবস্তুর অভাবে সকল চেষ্টা বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে। আবার খাদ্য যদিই বা কোনপ্রকারে সংগৃহীত হয়, যানবাহনের অসুবিধায় উহা যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দেওয়া দুস্কর হইয়া উঠিয়াছে।

সরকারের পরিকল্পিত ব্যবস্থায় বিশেষ কিছু কাজ হইবে বলিয়া মনে হয় না। দশজনকে লইয়া পরস্পরের সংযোগসূত্রে কাজ করিবার ব্যবস্থা তাহাতে নাই। যে কোন মূল্যেই চাউল কিনিতে হইবে - এই বেপোরোয়া নীতির ফল আজ মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাংলাদেশে খাদ্যশস্যের যথেষ্ট স্বল্পতা রহিয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে সরকারকে সরবরাহ ও বন্টন - উভয়ের পূর্ণ ভার

লইতে হইবে। ঐ দুইটি ব্যাপার এমন ভাবে চালাইতে হইবে, যাহাতে খাদ্যের অভাবে কোন শ্রেণীর লোককেই উপবাস করিতে না হয়। কিন্তু ইহার জন্য চাই এমন গভর্ণমেন্ট যাঁহার উপর দেশের সর্বশ্রেণীর আস্থা আছে। গভর্ণমেন্টের স্বার্থ ও দেশবাসীর স্বার্থ অভিন্ন হইলে তবেই জাতীয় কল্যাণের এই নীতি সাফল্যমন্ডিত হইতে পারে।

এই ভয়াবহ অবস্থা হইতে পরিত্রাণ পাবিার জন্য আমার পরিকল্পনা আমি ইতিপূর্বেই গভর্ণমেন্ট ও দেশবাসীর নিকট উপস্থাপিত করিয়াছি। কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চলে বাংলার মোট জনসংখ্যার শতকরা সাত ভাগ মাত্র বাস করে। বাংলার গ্রামের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ, উহা পাঁচ হাজার ইউনিয়ন বোর্ডে বিভক্ত। ইহা ব্যতীত মিউনিসিপ্যালিটির সংখ্যাও প্রায় এক হাজার হইবে। এই বিরাট পল্লী অঞ্চল আজ একেবারে চাউলশূন্য হইয়া গিয়াছে। গ্রামবাসী তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করিতেছে। বাংলাকে বাঁচাইতে হইলে ঐ পাঁচ হাজার ইউনিয়ন বোর্ড ও এক হাজার মিউনিসিপ্যালিটি কেন্দ্রে অবিলম্বে চাউল, আটা ও অপরাপর খাদ্যবস্তু পাঠাইতে হইবে। প্রতি কেন্দ্র গড়ে অন্তত হাজার মন করিয়া পাঠাইয়া (কতকগুলি বড় শহরে বেশি পাঠাইবার প্রয়োজন হইবে) গভর্ণমেন্ট আজই কাজ আরম্ভ করিয়া দিন। স্থানীয় সাহায্য এবং বাহির হইতে যাহা প্াওয়া যাইবে, তাহার দ্বারা অবিরত এই ব্যবস্থাকে পুষ্ট করিতে হইবে। রাষ্ট্র ও জনসাধারণের সমবেত প্রচেষ্টায় এই প্রকার ব্যাপক সাহায্য অবিলম্বে যদি আরম্ভ না করা হয়, তবে পৌষ মাসে আমন ফসল উঠিলে তাহাও দেশবাসীর ভোগে আসিবে না। উহার সংগ্রহ ও বন্টনে অব্যবস্থা চলিবে, দুর্ভিক্ষ দেশের মধ্যে স্থায়ী হইয়া রহিবে।

প্রত্যেকটি কেন্দ্রে সরকারি গুদাম থাকিবে। একজন দায়িত্বশীল সরকারি কর্মচারী উহার তত্ত্বাবধান করিবেন। তিনি স্থানীয় ইউনিয়ন বা মিউনিসিপ্যালিটি এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সাহচর্যে সাম্প্রদায়িকতা ও দলগত প্রশ্ন আদৌ আমলে না আনিয়া সাহায্য ব্যবস্থা করিবেন। মানুষ আজ খাদ্যের প্রত্যাশায় ঘরবাড়ি ছাড়িতেছে। এইরকম ব্যবস্থায় তাহা নিবারিত হইতে পারে। দুর্গত গ্রামবাসীদের জন্য যে শস্যভান্ডার গঠিত হইবে, শস্যের পরিমাণ তাহাতে প্রায়োজনের অনুরূপ না হইলেও এইরূপ ব্যবস্থার ফলে

জনসাধারণের সামাজিক চেতনা জাগ্রত হইবে। ভান্ডার পরিপুষ্ট করিবার কাজে তাহারাই শেষে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিবে। দুর্ভিক্ষ বাংলার চিরাচরিত জীবনরীতি নষ্ট করিয়া দিয়াছে, মাত্র এই উপায়েই তাহার পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব।

কলিকাতা ও অন্য কয়েকটি বড় শহরের জন্য শস্যভান্ডার সম্পূর্ণ পৃথক রীতিতে গড়িয়া তুলিতে হইবে। গ্রামাঞ্চল অভুক্ত রাখিয়া শহর বাঁচাইয়া রাখা - ইহা যেন কখনও না ঘটিতে পারে।

খাদ্যসংগ্রহ ও বন্টন সম্বন্ধে এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সরকারি তরফ হইতে হয়তো দুইটি আপত্তি উঠিবে - প্রথম, মাল কোথায়? দ্বিতীয়, যানবাহনের উপায় কি? গভর্ণমেন্টের হাতে কি পরিমাণ খাদ্যশস্য সঞ্চিত আছে, জনসাধারণকে তাহা কখনও জানানো হয় না। গত দুই মাস ধরিয়া বাংলায় প্রচুর মাল আমদানি হইতেছে, কিন্তু 'ততঃ কিম্' - এ তথ্য আমাদের নিকট একেবারে রহস্যাচ্ছন্ন। যে কোন উপায়ে হউক, খাদ্যশস্য চাই-ই। বিভিন্ন প্রদেশ হইতে, ভারতের বাহির হইতেও সরকার অবিলম্বে আমদানির ব্যবস্থা করুন। যুদ্ধের অত্যাবশ্যক প্রয়োজনে বহু প্রতিষ্ঠানকে পাঁচ-ছয় মাসের উপযুক্ত খাদ্য মজুত করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। রেল কোম্পানী, পোর্টট্রাস্ট, কলকারখানার মালিক ও সামরিক কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা আহ্বান করা হউক। তাঁহারা মজুত খাদ্যের কতক অংশ সাময়িক ভাবে ধার দিয়া জাতির প্রাণ বাঁচাইতে সাহায্য করুন। শস্যভান্ডার আবার পূর্ণ করা যাইবে, কিন্তু মানুষের প্রাণ গেলে আর ফিরিবে না। নূতন ফসল উঠিলেই এই ঋণ শোধ দেওয়া হইবে। ভারত সরকার উহার দায়িত্ব লইবেন। গত আট মাস ধরিয়া আমরা বারংবার বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানি করিতে বলিয়াছি। এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহার জন্য কে দায়ী, তাহা বিচার করা প্রয়োজন।

পত্র-পত্রিকার মারফৎ শুনানো হইয়া থাকে - সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ অজস্র খাদ্যসম্ভার মজুত করিয়া রাখিয়াছেন। যে সব দুর্ভাগা জাতি এখন অক্ষশক্তির অধীন, তাহারা মুক্তি লাভ করিলে ঐ খাদ্য দিয়া তাহাদিগকে সাহায্য করা হইবে। কিন্তু সৌভাগ্যবান আমরা আজ বৃটিশ রাজত্বে বসবাস করিয়াও হাজারে হাজারে মারা যাইতেছি। ঐ সুবিপুল খাদ্যভান্ডারের কিছু অংশ কেন আমাদিগকে দেওয়া হইতেছে না?

ক্যানবারা হইতে রয়টারের টেলিগ্রামে (২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩) জানিতে পারি -

কৃষি ও বাণিজ্যমন্ত্রী মিঃ উইলিয়ম জোনস স্কালে বলিয়াছেন, যুক্তরাষ্ট্র যদি জাহাজ যোগাইতে পারেন, একক অষ্ট্রেলিয়াই দুর্গত ভারতের যত গম দরকার- সমস্ত সরবরাহ করিতে পারে। চালান দিবার জন্য গম মজুত হইয়া আছে, এখন জাহাজ পাইলেই হয়। জাহাজ মিলিবে কিনা, যুক্তরাষ্ট্রের তরফ হইতে ও সম্পর্কে কোন উচ্চবাচ্য নাই। অষ্ট্রেলিয়া মাল পাঠাইবার জন্য তৈয়ারী হইয়াই আছে। আনুমানিক আশি হইতে একশ মিলিয়ন বুশেল গম অষ্ট্রেলিয়ায় আছে। আবার কয়েক মাসের মধ্যে নতুন ফসল উঠিবে। অতএব ভারতে পাঠাইবার মতো প্রচুর গম রহিয়াছে।

মিঃ স্কালে কয়েক সপ্তাহ আগে একবার বলিয়াছেন, ভারতে পঞ্চাশ হাজার টন গম পাঠান হইয়াছে, জাহাজ পাইলে আরও পাঠান যাইবে।

অতএব দেখা যাইতেছে প্রায় আড়াই কোটি মন গম অষ্ট্রেলিয়ায় মজুত আছে। ভারতবর্ষে গম পাঠাইবার জন্য তাহারা উদ্‌গ্রীব অথচ জাহাজের ব্যবস্থা হইতেছে না। বৃটিশ গভর্ণমেন্ট ইচ্ছা করিলেই বাংলার এই সঙ্কটের অবসান ঘটাইতে পারেন। ইচ্ছা থাকিলেই উপায় হইবে।

আমার পরিকল্পনা সম্পর্কে দ্বিতীয় আপত্তি উঠিতে পারে, যানবাহনের অভাব - পল্লীতে পল্লীতে খাদ্য পৌঁছানো হইবে কি উপায়ে? কিন্তু এই আপত্তি একেবারে ভিত্তিহীন। একান্ত প্রয়োজন বলিয়া বুঝিলে যানবাহনের অভাব হইবে না। পনের দিনের জন্য একটি ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হউক। সমস্ত সাধারণ কাজকর্ম বন্ধ রাখিয়া রেল স্টিমার নৌকা মোটরভ্যান সামরিক ও বেসামরিক লরি এমন কি গরুর গাড়ী পর্যন্ত খাদ্য বহিবার কাজে লাগিয়া যাক। বাংলার লক্ষ লক্ষ অনশনক্লিষ্টের জন্য শস্যভান্ডার গড়িয়া তোল - ইহার অধিক প্রয়োজনীয় কর্তব্য বর্তমান মুহূর্তে আর কি আছে? আজ যদি বাংলাদেশে শত্রুর আক্রমণ হইত, যানবাহনের অভাবে আমরা কি নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে পারিতাম? দুর্ভিক্ষ ও মহামারী জাপানি অভিযানের চেয়ে কোন অংশে কম সাংঘাতিক নয়। এই ব্যাপারটিও যুদ্ধ সংক্রান্ত জরুরি প্রয়োজন বলিয়া মনে করিতে হইবে। বাংলা আজ প্রায় অন্তিম দশায় উপস্থিত হইয়াছে। এখনও যদি

তাহাকে বাঁচাইবার অকপট আন্তরিক চেষ্টা আরম্ভ হয়, তাহা হইলে শ্রেণী নির্বিশেষে জনসাধারণ সাহায্যদানে কার্পণ্য করিবে না। প্রয়োজন হইতেছে উদ্যম, দূরদর্শিতা ও অদম্য ইচ্ছাশক্তির।

প্রতিদিন - প্রত্যেকটি মুহূর্ত এখন পরম মূল্যবান। বাংলার বিভিন্ন অংশ হইতে দুঃখ দুর্গতি ও অভাবের অতিশয় শঙ্কাজনক বিবরণ পৌঁছিতেছে। এই নিদারুণ বিপদের দিনে জনহিত প্রচেষ্টায় আমলাচক্রের অকর্মণ্যতা ও ঔদাসীন্যের তুলনা নাই। আমাদের নামে দোষারোপ করা হয়, এই খাদ্যসঙ্কট ব্যাপারটিকে আমরা রাজনীতির ক্ষেত্রে টানিয়া আনিয়াছি। বাস্তবিক, রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার জন্যই তো ভারতবর্ষের এই অর্থনৈতিক দুরবস্থা। এবং সেই কারণেই বাংলা আজ দুর্গতির চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে।

খাদ্যকে আমরা কোনক্রমেই রাজনীতির ক্রীড়াবস্তুতে পরিণত করিতে চাই না। কিন্তু যখন দেখিতে পাই, এই দুর্ভিক্ষের মূল কারণ-শাসকবর্গের ত্রুটি ও নির্বুদ্ধিতা, তখন সে কথা ব্যক্ত করিয়া ভ্রান্ত নীতি পরিবর্তনের দাবি করা কি ভারতীয় হিসাবে আমাদের পক্ষে মহাপাতক হইয়াছে?

ইংরেজ এই অবস্থায় পড়িলে ইংল্যান্ডে আজ কি ঘটিত? অনাহার, মহামারী ও মৃত্যুর তাড়নায় এমনি করিয়া যদি কাউন্টি হইতে কাউন্টিতে, শহর হইতে দলে দলে নরনারী মরীয়া হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইত, কঙ্কালসার নগ্নশিশুর আর্তনাদে লন্ডনের রাজপথে যদি এমনি শ্মশানের ছায়া নামিত, হাইডপার্ক হ্যাম্পস্টেড-হীথের উপর মলমূত্রে সিক্ত ভূমিশয্যায় শত শত শব পড়িয়া থাকিত, তাহা হইলে কি দশা হইত ডাউনিং স্ট্রীটের? ক্যাবিনেট কতক্ষণ টিকিত?

ভারতবর্ষের আজ কি অবস্থা? যুদ্ধ ব্যাপারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মুষ্টিমেয় ভাগ্যবানকে বাদ দিলে বাকি সমস্ত দেশবাসীর অবস্থা মর্মান্তিক হইয়াছে। আমাদের জাতীয় ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন। অথচ এই দুর্গতির প্রতিবাদে একটি অঙ্গুলি তুলিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। দেশপ্রেমিক সহস্র সহস্র নরনারী বন্দীশালায় অবরুদ্ধ। আর সকলের উপরে রহিয়াছে আমাদের অস্থিমজ্জাগত সনাতন অদৃষ্টবাদ - সকল দুঃখ-দুর্দশার জন্য আমরা দুরতিক্রম নিয়তিকে দায়ী করিয়া থাকি। মানুষই যে আমাদের জন্মগত অধিকার নিরুদ্ধ করিয়া

দাঁড়াইয়াছে, এই নির্মম সত্য ভুলিয়া যাই। রাজনৈতিক অধীনতা, অর্থনৈতিক সঙ্কট, চিত্তের ক্লৈব্য, বুদ্ধির জড়ত্ব - সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষকে আজ নূতন সঞ্জীবনীমন্ত্রে দীক্ষা লইতে হইবে।"

* * *

এইভাবে যেখানেই মানুষ বিপদে পড়েছে, সেখানেই সাহায্যের ডালি নিয়ে এগিয়ে গেছেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। আর্তের আর্তিতে সাড়া দিয়ে দুঃখীর দুঃখ মোচনের দায়িত্ব নিয়ে এভাবে আর কাউকে এগিয়ে আসতে দেখা যায়নি। বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম যখন দূরারোগ্য রোগে আক্রান্ত তখন শ্যামাপ্রসাদের বদ্যনাতায় গড়ে উঠেছে 'নজরুল সাহায্য কমিটি'। ঋণে জর্জরিত নজরুলকে অর্থ সাহায্য দিতে এগিয়ে এসেছেন কে? না, শ্যামাপ্রসাদ। এমনকি মধুপুরে নিজের বাড়িতে রেখে কবিকে চিকিৎসার ব্যবস্থাও করে দিয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত নজরুল বিশেষজ্ঞ অচিন্তকুমার সেনগুপ্তের গবেষণালব্ধ কাজের কিছু অংশ এখানে তুলে দিলাম।

"নজরুল তখন বদ্ধ উন্মাদ।...সঙ্কটের উপর সঙ্কট,...অর্থ সঙ্কট নজরুলের প্রথম দুশ্চিন্তা।"

"এগিয়ে এল শ্যামাপ্রসাদ - সহৃদয় শ্যামাপ্রসাদ। শুধু কাগজে কলমে নয়, সশরীরে। শ্যামবাজার রোডের বাড়ির সেই খাড়া সিঁড়ি বেয়ে সচক্ষে দেখল নজরুলকে। মেঝেয় পাতা ফরাস বিছানো, তার পাশে বসল। নজরুল কথা বলতে পারছে না বলে কাগজে আঁকা বাঁকা অক্ষরে লিখে দিচ্ছিল তার অভাব অভিযোগের ফিরিস্তি। শ্যামাপ্রসাদ তাই পড়ল, আর ওঠার আগে নজরুলের হাতে পাঁচশোটা টাকা গুঁজে দিল।

"যে ডাক্তার চিকিৎসা করছিলেন তিনি সম্প্রতি মধুপুরে চলেছেন বলে নজরুলও মধুপুর যেতে চাইল। সেখানে তাঁর তত্ত্বাবধানে ভালো থাকব। কিছু বিশ্রামও পাওয়া যাবে। আর একটানা কিছু বিশ্রাম পেলেই আমি সেরে উঠব ঠিক। হ্যাঁ আমার বন্ধু বলেছেন, বিশ্রাম, বিশ্রাম।

"ডাক্তার তাই অনুমোদন করলেন।"

"সপরিবারে নজরুলকে পাঠানো হল মধুপুরে।"

পরবর্তীকালে এক চিঠিতে (১২-৭-৪২) নজরুল শ্যামাপ্রসাদকে লিখলেন-

"...মধুপুরে এসে অনেক relief and relaxation অনুভব করছি। মাথার যন্ত্রণা অনেকটা কমেছে। জিহ্বার জড়ত্ব সামান্য কমেছে। আপনি এত সত্ত্বর আমার ব্যবস্থা না করলে হয়ত কবি মধুসূদনের মত হাসপাতালে আমার মৃত্যু হ'ত।

"এই... Coalition ministry- র একমাত্র আপনাকে আমি অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি - আর কাউকে নয়। আমি জানি, আমরাই এই ভারতবর্ষকে পূর্ণ স্বাধীন করব - সেদিন বাঙ্গালীর আপনাকে ও সুভাষ বোসকে সকলের আগেই মনে পড়বে - আপনারাই হবেন এদেশের সত্যকারের নায়ক।"

অসুস্থ কবি প্রায় দু'মাস মধুপুরে কাটিয়ে ১৯৪২ সালের ১১ সেপ্টেম্বর কলকাতায় ফিরে এলেন। ঐ সময় সমগ্র ভারতবর্ষে আছড়ে পরেছে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের ঢেউ। অসুস্থ কবি তাই তখন সবার দৃষ্টির বাইরে। ইতিমধ্যে কবি বাকরুদ্ধ হয়ে গেছেন। বিদ্রোহী কবির তখন চেতনাবোধও লুপ্ত। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ ভোলেননি কবিকে। ১৯৫২ সালে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও ডাঃ বিধান রায়ের উদ্যোগে গড়ে উঠল নজরুল নিরাময় সমিতি। সমিতির উদ্যোগে কবি নজরুলকে পাঠানো হল রাঁচিতে। কিন্তু অবস্থার বিশেষ উন্নতি না হওয়ায় কবিকে বিদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হল। ১০ই মে, ১৯৫৩ নজরুল-প্রমীলা লন্ডল যাত্রা করলেন। ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৫৩ কবি লন্ডন ভিয়েনা থেকে কলকাতায় ফিরে এলেন। তখন শ্যামাপ্রসাদ আর নেই। বোধশক্তিহীন নজরুল বুঝতেও পারলেন না তাঁর দুঃসময়ের সবচেয়ে কাছের বন্ধু আর কোনদিন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারবেন না।

* * *

বাস্তববাদী শ্যামাপ্রসাদ বুঝতে পেরেছিলেন দেশভাগ হচ্ছেই। এবং দেশভাগের সাথে সাথেই ব্যাপক দাঙ্গা শুরু হবে বাঙলা ও পাঞ্জাবে। শ্যামাপ্রসাদ দাবি করলেন, দেশভাগ হলে বাঙলা ও পাঞ্জাবকেও ভাগ করতে

হবে। মুসলিম লীগের দাবি, চাই সম্পূর্ণ বাঙলা ও পাঞ্জাব। বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে জিন্না দাবি করলেন যে এটা একটা 'sinister move actuated by spite and bitterness' । লীগ নেতা আক্রম খাঁ-র দাবি, অবিভক্ত বাংলা আর পাঞ্জাবকে নিয়েই গঠিত হবে পাকিস্তান। মসজিদে মসজিদে বাঙলা আর পাঞ্জাব ভাগের বিরুদ্ধে প্রস্তাব নেওয়া হল। সারা ভারত মুসলিম লীগের তরফ থেকে অভিযোগ করা হল যে, মুসলমানদের রাজনৈতিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত করার এক 'বর্ণহিন্দু চক্রান্ত' হল বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব। এর ফলে মুসলমান ব্যবসায়ীদের প্রভূত ক্ষতি হবে।

লীগের বঙ্গভঙ্গ বিরোধিতার মূল উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ বাঙলাকে পাকিস্তানের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া। বাঙলাকে পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করতে চাওয়া হয়েছিল প্রধানত কলকাতাকে পাওয়ার জন্য। জিন্না তো বলেই ফেললেন যে "what is the use of Bengal without Calcutta" সুরাবর্দীর মত হল, বাঙলা ভাগ হতে দেওয়া চলবে না, তাহলে মুসলমানরা 'the rich prize of Calcutta' পাবে না।

ওদিকে শ্যামাপ্রসাদ তাঁর সিদ্ধান্তে অটল। দেশভাগ হলে বাঙলাকেও ভাগ করতেই হবে। বাঙ্গালী হিন্দুদের জন্য Home Land চাই। ১৫ই মার্চ, ১৯৪৭ কলকাতায় বঙ্গীয় হিন্দু-মহাসভার এক সম্মেলনে বাঙ্গালী হিন্দুদের জন্য আলাদা Home Land দাবি করে প্রস্তাব নেওয়া হল। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার, ভাষাবিদ ডঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, পন্ডিত রামশঙ্কর ত্রিপাটি প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। এই সম্মেলনে শ্যামাপ্রসাদ বাঙলা ভাগের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন এবং বলেন যে পূর্ব অভিজ্ঞতায় এটা পরিষ্কার প্রমাণিত হয়েছে যে পাকিস্তানে হিন্দুরা সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে না এবং তাদের জন্য আলাদা Home Land তৈরী না হলে অত্যাচারিত হয়ে তারা অন্য কোথাও আশ্রয়ের অধিকার দাবি করতে পারবে না। শ্যামাপ্রসাদের বক্তব্যকে সমর্থন জানিয়ে সম্মেলনে ডঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায় বক্তব্য রাখেন। এই সম্মেলনেই জানানো হয় যে, প্রদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে যে ১০৬টি প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে তার মাত্র ৬টিতে বাঙলা ভাগের বিরোধিতা করা হয়েছে। শ্যামাপ্রসাদ আরও দাবি করেন যে যদি

বাঙলাকে ভাগ করা সম্ভব হয় তবে পূর্ব পাকিস্তানও ধ্বংস হয়ে যাবে (If this succeeds, the East Pakistan will virtually perish) । এই সম্মেলনে ঠিক হয় যে বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের স্বপক্ষে জনমত তৈরী করার জন্য ব্যাপক প্রচার চালানো হবে।

হিন্দু মহাসভার এই সর্বাত্মক কার্যক্রমের ফল মিলতে শুরু করল সাথে সাথে। অমৃতবাজার পত্রিকা বঙ্গভঙ্গের উপর গ্যালপ পোলের (Gallup Poll) মাধ্যমে মতামত সংগ্রহ করে। দেখা যায় যে ৯৮.৩ শতাংশ বাঙ্গালী হিন্দুই বঙ্গভঙ্গের পক্ষে। মাত্র ০.৬ শতাংশ মতামত বঙ্গভঙ্গের বিরোধী। (Amrita Bazar Patrika, 23-03-47) ।

৪ এপ্রিল ১৯৪৭-এ তারকেশ্বরে হিন্দু মহাসভার তিনদিন ব্যাপী Bengal Partition Convention শুরু হয়। প্রায় ২৫,০০০ মানুষের উপস্থিতিতে শ্যামাপ্রসাদ এই সম্মেলনে বলেন যে বাঙলা ভাগ করা ছাড়া হিন্দু বাঙ্গালীর বাঁচার কোন উপায় নেই এবং এটা হল বাঙ্গালীর জীবনমরণের প্রশ্ন। (It is a question of life and death for us, the Bengalee Hindus)। তিনি দাবি করেন যে, "we want our home land and we shall have it - let this be our motto. Now or Never - let this be our slogan." এই সম্মেলনে আরো ঠিক হয় যে বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব কার্যকর করার জন্য ১,০০,০০০ স্বেচ্ছাসেবকের একটি বাহিনী গড়ে তোলা হবে। ৪মে বঙ্গভঙ্গের সমর্থনে প্রদেশে একই সাথে এবং একই সময়ে ২,০০০ জনসভার আয়োজন করা হয়।

স্বাভাবিকভাবেই বঙ্গভঙ্গের এই হিন্দু মহাসভা সংগঠিত আন্দোলনের বিরোধিতায় নামল কংগ্রেস। গান্ধী তো 'Condemn the movement of which Shyama Prasad Mookherjee and Hindu Mahasabha are chief protagonists'.

গান্ধী ও অন্যান্য কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ চাইছিলেন আপদ বিদায় হোক। সম্পূর্ণ বাঙলা পূর্ব-পাকিস্তানে চলে যাওয়াতে কংগ্রেসের কোন আপত্তি ছিল না। ৬ই জানুয়ারী ১৯৪৬, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির তরফ থেকে ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবের বিরোধিতা করে যে মন্তব্য করা হয়েছিল সেখানে অসম সীমান্তপ্রদেশ এবং শিখদের প্রসঙ্গ থাকলেও বাংলার ৪৫% হিন্দু অধিবাসীর কথা বিন্দুমাত্র বলা হয়নি। বরং গান্ধী অসমকে কংগ্রেসের মতের বিরুদ্ধে

মিশনের বৈঠকে যোগদান না করে বেরিয়ে আসার পরামর্শ দিলেও বাংলা সম্পর্কে নীরব রইলেন। বাংলার প্রতিনিধি হিসাবে যারা ঐ কমিটির বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তাঁরাও নীরব থেকে নিজেদের অযোগ্যতা এবং অক্ষমতার পরিচয় দিলেন।

কিন্তু কংগ্রেস ও গান্ধী নামে মুগ্ধ হয়ে দেশের ও জাতির মঙ্গল কামনায় যাঁরা নিজেদের স্বাধীন চিন্তা বিসর্জন দেননি তাঁরা সবাই তখন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সাথে। ৭ই মে, ১৯৪৭, মেঘনাথ সাহা, যদুনাথ সরকার, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বুদ্ধিজীবীরা বাঙ্গালী হিন্দুর নিরাপত্তার জন্য একটি আলাদা প্রদেশের দাবী তোলেন। 'শনিবারের চিঠি' লেখে, "পৃথক হইয়া যাওয়াই ভাল।" প্রবাসীর পরামর্শ "দুই সম্প্রদায়ের মিলনের আশা সুদূরপরাহত। ...বঙ্গবিভাগের প্রস্তাব স্থিরভাবে বিচার করা প্রয়োজন হইয়াছে।" কলকাতা কর্পোরেশনের ৩৭ জন কাউন্সিলার প্রস্তাব নেন 'বাংলার হিন্দু ও জাতীয়তাবাদীদের জন্য একটি আলাদা বাসভূমি চাই।' এমনকি, দুই কংগ্রেস নেতা ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং কিরণ শঙ্কর রায় শ্যামাপ্রসাদকে জানান যে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিকে তাঁরা বাঙলা ভাগের দাবি মেনে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করবেন।

এবার চাল চাললেন লীগ নেতা শহীদ সুরাবর্দী। সঙ্গে দোসর প্রাক্তন কংগ্রেসী নেতা শরৎচন্দ্র বসু এবং কম্যুনিস্টরা। সুরাবর্দীর প্রস্তাব, ভারত বিভক্ত হয় হোক, অবিভক্ত বাঙলাকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলা হবে। সেই বাঙলা হবে 'an independent undivided Sovereign Bengal in divided India." বাঙ্গালীর সেন্টিমেন্টে সুরসুরি দেওয়ার সবরকম চেষ্টা করলেন সুরাবর্দী। তাঁর দাবি, বাঙলা ভাগ হলে হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই ক্ষতি; বিভক্ত বাঙলা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের শোষণের শিকার হবে। (Bengal divided will mean a Bengal prey to the people of other parts of India waiting to be exploited for their benefit.)

শরৎ বসুর স্বপ্ন, বাঙলা হবে একটি স্ব-শাসিত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। কম্যুনিস্টদের দাবি 'a united and Free Bengal within a Free India'। পার্টির মুখপত্র 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় (১-৬-৪৭) লেখা হল 'বঙ্গভঙ্গ রোধ করুন। ঐক্যবদ্ধ ভারতে স্বাধীন বাঙলা গড়ুন।'

কিন্তু সুরাবর্দীর উদ্দেশ্য ছিল অন্য। তিনি চাইছিলেন প্রথমে স্বাধী বাঙলাদেশ হোক, পরে কোন এক ছুতোয় তা-পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত কর যাবে। অর্থাৎ সম্পূর্ণ বাঙলাকে কৌশলে পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত করা সুরাবর্দীর এই চালাকির বিশদ বর্ণনা নির্মল কুমার বোসের 'My days wit Gandhi' গন্থে বর্ণিত আছে।

সুরাবর্দীর 'স্বাধীন সার্বভৌম বাঙলা'র মদত বৃটিশ সরকারও দিতে লাগল শ্যামাপ্রসাদের মতে 'স্বাধীন বঙ্গ' প্রস্তাবের পিছনে আসলে বৃটিশ পুঁজিপতিদে মদত। কারণ, বাঙলা ভাগ হলে পাটচাষের এলাকাগুলি চলে যাবে পূর্ববঙ্গে অথচ চটকলগুলি (Jute mills) থেকে যাবে পশ্চিমবঙ্গে। মাউন্টব্যাটেনে সঙ্গে দেখা করে সুরাবর্দীর কাকুতি-মিনতি খেয়াল করার মতো। কী তাদে অন্যায় যে বৃটিশ সরকার এইভাবে লাথি মারছে।'I do not see how you ca kick us out ! what have we done to be expected! ' সুরাবর্দীর প্রতি দর দেখিয়ে বাঙলার গভর্ণর ব্যারোজ মাউন্টব্যাটেনেকে গোপনে লেখে 'Partition is politically and economically a deplorable prospe expcially for Eastern Bengal.'

কিন্তু 'ন্যাড়া' বাঙ্গালী হিন্দুরা আর 'বেলতলায়' যেতে রাজী নয়। এব শ্যামাপ্রসাদ তাদের আর 'বেলতলায়' যেতে দেবেন না। তাই কম্যুনিস্ট পার্টি স্বীকার করতে বাধ্য হল 'হিন্দু মহাসভার হিন্দু জাতীয়তাবাদই আজ বাংলা হিন্দু মধ্যবিত্তের মন আচ্ছন্ন করিয়াছে।'

কিন্তু বাঙলা ভাগ কি মুসলমানরা নীরবে মেনে নেবে? বাঙলার গভর্ণ ব্যারোজ 'TOP SECRET" নোটে লেখেন যে কলকাতাকে বাদ দিয়ে পূর্ব রাষ্ট্র হলে রণক্ষেত্র হয়ে যাবে। ২৮শে মে ব্যারোজ মাউন্টব্যাটেনকে লেখে যে বাঙলাভাগ হলে ব্যাপক হাঙ্গামার আশঙ্কা রয়েছে। তাহলে মুসলমান ব্যাপক দাঙ্গা বাধাবে। 'Muslims will.....adopt every form of resistenc in the course of which much blood will be shed and muc property devasted especially in Calcutta'। তাঁর রিপোর্টে আর জানানো হল যে এত ব্যাপক পরিমাণে বোমা ও অস্ত্র মজুতকরা হয়েছে য বাঙলায় অভূতপূর্ব (hitherto not experienced in Communa disturbances in Bengal)।

তাহলে হিন্দুরা বাঁচবে কি ভাবে? '৪৬ এর দাঙ্গার ঘা তখনও শুকিয়ে যায়নি। গান্ধী ও কংগ্রেসের অহিংসার ফাঁদে পা দেওয়ার ফল কি হয়েছিল তা আননন্দবাজার পত্রিকা (২৫-৮-৪৬) বলে দিয়েছে, 'কলিকাতার সাম্প্রতিক দাঙ্গার সময় বহু হিন্দু নারী অপহৃতা হইয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া যাইতেছে।' বিশিষ্ট গণিত বিশেষজ্ঞ যাদব চক্রবর্তীর পুত্র নিজ চোখে দেখেছেন যে লীগ গুন্ডারা হিন্দু মহিলাদের সম্পূর্ণ বিবস্ত্র করে প্রকাশ্যে হাঁটিয়ে নিয়ে চলেছে। এবারও কি তবে নারীত্বের অবমাননা হবে লীগ গুন্ডাদের হাতে?

লীগ গুন্ডাদের আক্রমণ প্রতিহত করে বাঁচতে হলে প্রয়োজন অস্ত্রের। মহাসভার নতুন স্লোগান হল 'প্রত্যেক হিন্দু মহল্লাকে দুর্গে পরিণত করতে হবে।' শ্যামাপ্রসাদ ঠিক করলেন অস্ত্র আনবেন বার্মা থেকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঠিক পর পরই বার্মায় তখন 'arms are flying। এই অস্ত্র আনার ব্যাপারে শ্যামাপ্রসাদ প্রথম যোগাযোগ করলেন বার্মা সরকারের অর্থ সচিব নলিনী চক্রবর্তীর সঙ্গে। নলিনীবাবু অস্ত্র কিনতে সাহায্য করবেন। ঐ খরিদ করা অস্ত্র ভারতে পৌঁছে দেবেন এম.কে.ট্যাম্বে। ট্যাম্বে ছিলেন 'South India Federation' -এর সভাপতি। ঠিক হয়েছিল যে ট্যাম্বে ঐ অস্ত্র ভারত-বার্মা সীমান্তে ভারতের দিক থেকে প্রথম চেকপোস্ট টামু পৌঁছে দেবেন।* কিন্তু এই পরিকল্পনা সফল হয়নি। শ্যামাপ্রসাদকে জড়িয়ে পড়তে হল অন্য সমস্যায়।

* * *

'তুমি তো আমাদের মতো সোজা মানুষ নও — তুমি দেশের জন্য সমস্ত দিয়াছ। তাই তো দেশের খেয়া-তরী তোমাকে বহিতে পারে না। সাঁতার দিয়া তোমাকে পদ্মা পার হইতে হয়, তাই তো দেশের রাজপথ তোমার কাছে রুদ্ধ, দুর্গম পাহাড় পর্বত তোমাকে ডিঙাইয়া চলিতে হয়; কোন বিস্মৃত অতীতে তোমারই জন্য তো প্রথম শৃঙ্খল রচিত হইয়াছিল। কারাগার তো শুধু তোমাকে

---

*এই তথ্য আমাকে জানিয়েছিলেন ঐ সময় ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের দুই বিশ্বাসী সৈনিক হিমাংশু দাশগুপ্ত এবং মানিক ব্যানার্জী। হিমাংশু দাশগুপ্ত বেহালার ইউনিক পার্কের বাসিন্দা। মানিক ব্যানার্জী মাঝদিয়ায় চুর্ণি নদীর ধারে আশ্রম বানিয়েছেন। অনাথ শিশুরা থাকে ওখানে।

মনে করিয়াই প্রথম নির্মিত হইয়াছিল, সেই তো তোমার গৌরব। তোমাকে অবহেলা করিবার সাধ্য কার! এই যে অগণিত প্রহরী, এই যে বিপুল সৈন্যভার, সে তো কেবল তোমারই জন্য! দুঃখের দুঃসহ গুরুভার বহিতে তুমি পারো বলিয়াই তো ভগবান এত বড় বোঝা তোমারই স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছেন।'

'পথের দাবী'র সব্যসাচীকে খুঁজে পায় বাদল। সহিত্যে নয়, কবিতায় নয়, উপন্যাসে নয়,— একটা দুরন্ত জীবনের মধ্যে। দুরন্ত-ই তো বটে। নতুবা কেন বাঁধন ছিঁড়বেন তিনি? কেন মায়ের স্নেহ, ভাইদের ভালোবাসা, পুত্র কন্যার মায়া, নিশ্চিন্ত জীবনের হাতছানি; সব ছেড়ে নিজেকে উৎসর্গ করবেন জাতির সেবায়? আর দুরন্ত না হলে তো হত না সব্যসাচী চরিত্র। শরৎচন্দ্র লিখতেন না 'পথের দাবী।'

বিজয়চন্দ্র মজুমদার বের করতেন 'বঙ্গবাণী পত্রিকা। কিন্তু চালাতে পারেননি। 'বঙ্গবাণী'র দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছিল মুখোপাধ্যায় ভাইদের হাতে; রমাপ্রসাদ, শ্যামাপ্রসাদ, উমাপ্রসাদ। নূতন ছন্দ নিয়ে আবির্ভাব ঘটল 'বঙ্গবাণী'র। প্রকাশিত হতে লাগল মরমী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মহেশ', 'সতী', 'অভাগীর স্বর্গ'। বাংলা সাহিত্য পত্রিকার জগতে 'বঙ্গবাণী' তখন নিজের জায়গা করে নিয়েছে। শরৎচন্দ্রকে অনুরোধ করা হলো যেন অগ্নিবীণা বেজে উঠে তাঁর কলমে। বেরিয়ে এল 'পথের দাবী'। বাংলা ১৯৩২ সালের ফাল্গুন মাস থেকে 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বের হতে লাগল এই জ্বলন্ত অগ্নিশিখা।

সব্যসাচীরা চিরদিনই বিপ্লব ঘটায়। নূতন প্রাণের ছোঁয়ায় থমকে থাকা ইতিহাসকে করে চলমান। শ্যামাপ্রসাদও তাঁর ব্যতিক্রম নন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়ে প্রথমেই আঘাত হেনেছেন পরাধীনতার দীর্ঘ নিষ্পেষণে হারিয়ে যাওয়া self-respect -এর উপর। বলে কী লোকটা! দেশীয় ভাষাতেও লেখাপড়া করা সম্ভব, উচ্চ শিক্ষায় নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করা সম্ভব। নতুন উপাচার্য নূতন নিয়ম করলেন, সর্বস্তরে সমস্ত বিষয়ে বাংলায় লেখাপড়া করা যাবে। অশীর্বাদ পাঠালেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯৩৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে রবীন্দ্রনাথ পূর্বেকর সমস্ত প্রথা ভেঙ্গে বক্তব্য রাখলেন বাংলায়। এখানেই ক্ষান্ত হলেন না শ্যামাপ্রসাদ। চালু করলেন বাংলায় অনার্স

কোর্স। সেই সঙ্গে চালু হলো হিন্দী ও উর্দু। হীনমন্যতা থেকে জেগে উঠুক জাতি। আর তা হতে হলে চাই নিজের ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা, নিজের উপর বিশ্বাস।

এই শ্রদ্ধা আর বিশ্বাসের এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করল বাংলার ছাত্র-যুবকেরা। দিল্লীতে আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার উপলক্ষে কলকাতায় ছাত্ররা মিটিং ও শোভাযাত্রার আয়োজন করল। ঠিক হল যে ওই শোভাযাত্রা ডালহৌসী স্ট্রীট (বি. বা. দী. বাগ) দিয়ে লালবাজার ও লালদিঘীর পাশ হয়ে যাবে। পুলিশের দাবি যে ওই এলাকা prohibited area। সুতরাং কোন মিছিল সেখান দিয়ে যেতে পারবে না। অন্য দিকে ছাত্ররা দৃঢ় সংকল্প। তারা মিছিল করবেই। পুলিশ গুলি চালাল। রামেশ্বর ব্যানার্জী সহ বহু মানুষ নিহত হল এই গুলিচালনায়। আহতের সংখ্যাও প্রচুর।

কিন্তু যাঁর আহ্বানে ছাত্র-যুবকরা এইভাবে মৃত্যুকে নিল আপন করে তাঁকে মিছিলে দেখা গেল না। বরং এক লিখিত বাণী পাঠিয়ে শরৎ বোস ছাত্রদের উপদেশ দিলেন যেন তারা শান্ত ছেলের মতো বাড়ি ফিরে যায়। ক্ষিপ্ত ছাত্ররা শরৎবাবুর এই বাণী টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল। ছাত্ররা অনড়। চলুক গুলি, কিন্তু পিছিয়ে আসবে না কোনভাবেই।

শ্যামাপ্রসাদ সেদিন কলকাতার বাইরে। বারাসাত, টাকী, বাদুড়িয়া গিয়েছিলেন মিটিং করতে। রাত ন'টার সময় ফিরে এসেই শুনলেন সমস্ত ঘটনা। বিশ্রাম না নিয়েই ছুটলেন ছাত্রদের কাছে। বিপুল উল্লাসে অভিনন্দন জানাল ছাত্র-যুবর দল। সারারাত শ্যামাপ্রসাদ রইলেন ছেলেদের পাশে। কারণ? শ্যামাপ্রসাদ রোজনামচায় লিখেছেন, 'ছেলেরা এবং পুলিশের কোন কোন লোক আমায় চলে আসতে মানা করেন। আমার উপস্থিতিতে অন্ততঃ আর প্রাণহানির সম্ভাবনা থাকবে না।'

পরদিন রামেশ্বর ব্যানার্জীর মৃতদেহ নিয়ে শোভাযাত্রা বের হবে। দেহ নিয়ে যাবার ছাড়পত্রের ব্যবস্থা করে দিলেন শ্যামাপ্রসাদ। এবারও অবস্থা সঙ্গীন। আগের দিন যে পথ দিয়ে মিছিল করে যেতে চেয়ে গুলি খেয়েছে রামেশ্বর সেই পথ দিয়েই চলেছে বাঁধভাঙ্গা বিরাট মিছিল। পুলিশও গুলি চালানোর জন্য প্রস্তুত। এলেন শ্যামাপ্রসাদ। এবার তাঁর নিজের কথাই শোনা যাক—

"আমি ধর্মতলা স্ট্রীটে যাব বলে তৈরী হলাম। রামেশ্বর ব্যানার্জীর দেহ

নিয়ে যাবার ছাড়পত্র হরিচরণ পুলিস অফিস থেকে আমার কাছে এনে দিল। নীহারেন্দু দত্তমজুমদার, মীরা দত্তগুপ্ত তার বাবা ও মাকে মোটর করে নিয়ে আমার বাড়িতে এলেন। মর্গে গিয়ে একবার ছেলের মৃতদেহ দেখবার জন্য হতভাগ্য পিতামাতার এই যাত্রা। রাস্তায় গেলাম তাঁদের গাড়ির কাছে। অবাক হলাম তাঁদের — বিশেষ ক'রে মাকে দেখে। খুব সহজ ভাবে এই আকস্মিক বিপদকে তাঁরা গ্রহণ করতে পেরেছেন দেখলাম। দেশের জন্য ছেলে ইংরেজের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছে — এতে শোকের কান্না তাঁরা কাঁদতে চান না। ছাড়পত্র মীরার হাতে দিলাম। নীহারেন্দু আমার সঙ্গে ধর্মতলায় চলল। সেখানে গিয়ে দেখি বিরাট ও সঙ্গীন ব্যাপার। লক্ষাধিক লোক সারা রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে — সবাই নিষিদ্ধ পথে এগিয়ে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। রাস্তার মাঝখানে পুলিস কমিশনার ও অন্যান্য কর্মচারীরা দাঁড়িয়ে। ইংরেজের গুলিগোলা সবই সাজান রয়েছে — নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি চালিয়ে শক্তির মহিমা প্রচার করতে যেন শশব্যস্ত। কংগ্রেসের নলিনাক্ষ আর দু'একজনকে দেখলাম। শরৎবাবু বলে দিয়েছেন ছেলেদের ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ফিরে যেতে, কিন্তু তারা যাবে না কিছুতেই — প্রাণ যায় ক্ষতি নেই। পুলিস কমিশনারের হুমকির ভয় তাদের নেই একটুও। আমাকে তিনি বল্লেন পুলিস লরীর উপরে উঠে ছেলেদের বুঝিয়ে বলতে। আমি উঠে জনতার পুরোপুরি আন্দাজ পেলাম — সে যেন বিশাল সমুদ্র আর মানুষ সব যেন ক্ষেপে আছে। আমি কমিশনার সাহেবকে লরীর উপর তুলে দেখালাম — বল্লাম, 'তুমি এদের যে পথে এরা চায় যেতে দাও। যদি বাধা দাও, অমনি বাধায় পারবে না! মেশিন্‌গান্‌ চালাতে হবে—আর হাজারে হাজারে লোক প্রাণ দেবে হাসতে হাসতে। জালীওয়ানালাবাগের চেয়ে বেশী মানুষ মারতে হবে — তবু এদের হটাতে পারবে না। আর এখন যদি শান্তভাবে এরা চলে যায়, আমি এদের বলে দেব সব রামেশ্বরের মৃতদেহ সৎকারের জন্য কেওড়াতলায় যাবে।' পুলিশ কমিশনার একটু ভেবে দেখবার জন্য নেমে গেলেন। ছেলের দলও তখন ক্ষিপ্তপ্রায়। তারা সব এগিয়ে চলল। আমি তখন তাদেরই মাঝে পুলিশ লরীর উপর। তখন কেন গুলি চালাল না জানি না। চালালে আমার সামনে আমার মাথার উপর দিয়ে চালাতে হত। কমিশনারও মাথা খুব ঠান্ডা রেখে কাজ করলেন।"

* * *

"সংসদের রেস্টুরেন্ট ও কাফের সমস্ত কর্মচারীরা যে একটি মানুষকে দিন রাত অভিশাপ দেয় তিনি ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। কেননা যখনই তিনি কিছু বলতে ওঠেন সংসদের বাইরে আর কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় না।" ভারতের এডমান্ড বার্ক, দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ পার্লামেন্টেরিয়ান, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে এভাবেই শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন 'জনসত্ত্বা' পত্রিকার সম্পাদক বৈদ্য বাচস্পতি।

কম্যুনিস্ট নেতা, প্রখ্যাত সাংসদ হীরেন মুখার্জী স্মৃতি চারণা করেছে "His parliamentary acumen was seen when, as 'leader' of a virtually one-man party, he could get togather a sizeable Opposition group of his own.....".

সংসদে স্বীকৃত বিরোধী দলের নেতা নন শ্যামাপ্রসাদ। হবেনই বা কি করে। যে পার্টির প্রতিনিধিত্ব করছেন শ্যামাপ্রসাদ সংসদে সেই জনসঙ্ঘের আসন সংখ্যা মাত্র তিন। সংসদে সমস্ত বিরোধী দলের মোট আসন সংখ্যা মাত্র ১২৫। যদিও ভোটের বিচারে দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস পেয়েছে মোট ভোটের মাত্র ৪৪.৬৩% । বিরোধী পক্ষের ভোট ৫৫.৭৭%।

বিরোধীদের মধ্যে আবার কম্যুনিস্ট ও তাদের বন্ধু দলগুলির মিলিত আসন সংখ্যা ২৬। কিন্তু তাঁরা কিছুতেই 'সাম্প্রদায়িক' শ্যামাপ্রসাদকে নিয়ে সম্মিলিত বিরোধী জোট করবেন না।

কিষাণ মজদুর প্রজা পার্টি ও প্রজা সোসালিস্ট পার্টির মিলিত আসন সংখ্যা ২২। তাঁরা শ্যামাপ্রসাদের কাছে প্রস্তাব দিলেন যে সংসদে শ্যামাপ্রসাদের নেতৃত্বে যদি কোন বিরোধী জোট হয় তবে তাঁরা সেখানে থাকবেন, তবে শর্ত হল, হিন্দু মহাসভাকে ওই জোট থেকে বাদ দিতে হবে।

'কেন ?' প্রশ্ন করলেন শ্যামাপ্রসাদ।

বাছা বাছা কিছু বিশেষণ প্রয়োগ করে সোসালিস্ট নেতারা জানালেন যে হিন্দু মহাসভা 'সাম্প্রদায়িক'। অতএব ওদের সাথে কোন রকম জলচল হতে পারে না।

হাসলেন শ্যামাপ্রসাদ। কয়েকদিন আগে এঁরাই শ্যামাপ্রসাদকে

'সাম্প্রদায়িক' বলে গালিগালাজ করতেন। আজ এঁরাই আবার 'সাম্প্রদায়িক' শ্যামাপ্রসাদের কাছে নালিশ নিয়ে এসেছেন হিন্দু মহাসভার সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। সোসালিস্ট নেতাদের পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন শ্যামাপ্রসাদ, "হিন্দু মহাসভাকে প্রস্তাবিত বিরোধী জোট থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার কোন পরিকল্পনা আমার নেই। আপনারা তো জনসঙ্ঘকেও বলেন সাম্প্রদায়িক। এবং I am number one political untouchable in the country। বরং আসুন, সংসদে আমরা minimum common programme -এর উপর ভিত্তি করে একজোট হই।'

শ্যামাপ্রসাদের যুক্তি মেনে নিলেন সোসালিস্ট নেতারা, কিন্তু এগিয়ে আসতে পারলেন না। পাছে 'সাম্প্রদায়িক' শ্যামাপ্রসাদের স্পর্শে পার্টিতে ভাঙন ধরে।

ছোট এই ঘটনায় একটি মহৎ দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠিত হল। সোসালিস্ট ব্লকের ২২ জন সাংসদের বিনিময়েও শ্যামাপ্রসাদ হিন্দু মহাসভার মাত্র ৪ জন সাংসদকে ত্যাগ করতে রাজী হলেন না। কিন্তু ছাড়লে পেতেন অনেক কিছুই। কিন্তু আদর্শকে political career-এর সাথে গুলিয়ে ফেললেন না শ্যামাপ্রসাদ।

সংসদে তখন অ-কম্যুনিস্ট ও অ-সোসালিস্ট বিরোধী শক্তি বিন্যাস এইরকম - জনসংঙ্ঘ ৩, হিন্দু মহাসভা ৪, অকালী দল ৪, ঝাড়খন্ড পার্টি ৩, তামিলনাড়ু ভয়লার্স পার্টি ৪, নির্দল এবং বাকী অন্যান্য আঞ্চলিক দলের মিলিত সাংসদ ৪৬। ঠিক হল যে এই সাংসদরা মিলে সংসদে একটি কংগ্রেস বিরোধী শিবির তৈরী করবেন যার নেতৃত্ব দেবেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় স্বয়ং। এই ব্যাপারে সমর্থন আদায়ের জন্য আকালি দলের সর্দার হুকুম সিং, ঝাড়খণ্ড দলের জয়পাল সিং, রাজেন্দ্র নারায়ণ সিং দেও, হিন্দু মহাসভার এন.সি. চ্যাটার্জী এবং কয়েকজন নির্দল সাংসদদের সাক্ষরিত একটি আবেদন পত্র প্রকাশ করা হল। ২৮শে মার্চ (১৯৫২) দিল্লীতে ওই দলের নেতারা এবং কুড়ি জন নির্দল সাংসদ মিলিত হলেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠল, শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে থাকলে নেহরু বেজায় চটবেন, শ্যামাপ্রসাদ তার দায়িত্ব নেবেন কি না? আদর্শহীন স্বার্থদুষ্ট এই রাজনীতি দেখে দুঃখ পেলেন শ্যামাপ্রসাদ। সঙ্গে তাঁর অসামর্থতার কথাও জানিয়ে দিলেন।

* * *

Walk alone, walk alone। একলা চলাতে যাঁর ছন্দপতন হয় না তাঁকে বাঁধিবে কে? বিরোধী নেতার স্বীকৃতি নেই, সর্ববৃহৎ বিরোধী জোটেরও নেতা নন, তবুও শ্যামাপ্রসাদ হয়ে উঠলেন সমস্ত বিরোধী দলের মুখপত্র। "They all (parliamentarians) considered him to be their chief spokesman and conceded to him, by implication, the right to reply, on behalf of the opposition, on all major questions."

১১ই মে, ১৯৫২। স্বাধীন ভারতের প্রথম সংসদের প্রথম অধিবেশনেই ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমাণ করে দিলেন যে পার্লামেন্টেরিয়ান হিসাবে তিনি অনন্য, অসাধারণ, অনবদ্য এবং অবিস্মরণীয়। 'Lion of Parliament' স্বীকৃতি দেওয়া হল তাঁকে। তাঁর অসাধারণ বাগ্মীতা, অনন্য সাধারণ যুক্তিজালের বিন্যাস, বিস্ময়কর ভাষার দখল প্রথম দিনটিতেই সংসদে তাঁর স্থান নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল। সংসদে সরকারীভাবে স্বীকৃত বিরোধী নেতা না হয়েও শ্যামাপ্রসাদ সমস্ত বিরোধী দলের প্রধান মুখপত্র।

অবশ্য এর আগে ১৯৪৭ সালে শ্যামাপ্রসাদ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় যোগ দিয়েছিলেন। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর জহরলাল নেহেরু বাবা সাহেব আম্বেদকর, জন মাথাই, সমুখন চেট্টী, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন খ্যাতনামা অকংগ্রেসী নেতাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় যোগ দিতে আহ্বান করেন। শ্যামাপ্রসাদ গুরুত্বপূর্ণ শিল্প দপ্তরের দায়িত্ব পান। তাঁর আমলেই চিত্তরঞ্জন রেলইঞ্জিন কারখানা, হিন্দুস্থান এয়ারোনটিক্স লিঃ, সিন্ধ্রি ফার্টিলাইজার প্রভৃতি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের বৃহৎ শিল্প গড়ে ওঠে। দেশে সমবায়ের (Co-operative) মাধ্যমে শিল্প পরিচালনা যে সম্ভব তার প্রথম স্বীকৃতিও দিয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। ১৯৪৮ সালে দক্ষিণ ভারতের তিরুনেলভেলি জেলার সল্ট পানস (Salt Pans) এর কর্মীরা লবণ প্রস্তুত করার জন্য একটি সমবায় গঠন করে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জমির জন্য আবেদন জানায়। ওই সময় এই ধরনের চিন্তা ছিল অভিনব। অতএব সরকারী লাল ফিতার বাঁধনে সমস্ত পরিকল্পনা আটকে পড়ে। ঐ সমবায় কর্মীদের পক্ষ নিয়ে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি আর ভেঙ্কটরমণ কর্মীদের প্রস্তাব শ্যামাপ্রসাদের কাছে পেশ করেন। সমস্ত শুনে শ্যামাপ্রসাদ সাথে সাথেই সমস্ত আপত্তি অগ্রাহ্য করে ওই সমবায় সমিতির জন্য জমির ব্যবস্থা করে দেন। আজ শ্রমিকদের নিজেদের যে কয়টি সমবায় আছে

তিরুনেলভেলীর এই সমবায় তার অন্যতম।

কিন্তু নেহরু মন্ত্রীসভায় শ্যামাপ্রসাদ বেশীদিন থাকতে পারলেন না। নেহরুর উদ্ধত ব্যবহার, চাতুরীপূর্ণ ছলাকলা, দুর্বল পররাষ্ট্র নীতি এবং স্বার্থদুষ্ট রাজনীতি শ্যামাপ্রসাদের পক্ষে নীরবে সহ্য করা সম্ভব হল না। ১৯৫০ সালে নেহরু-লিয়াকত চুক্তি সম্পাদিত হল। পাকিস্তানের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর তোষণ নীতির তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ৮ই এপ্রিল শ্যামাপ্রসাদ মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেন। ১৯শে এপ্রিল শ্যামাপ্রসাদ পার্লামেন্টে তাঁর পদত্যাগের কারণ ব্যাখ্যা করে যে বিবৃতি দেন তার প্রতিটি ছন্দে তাঁর সাবলীল ব্যক্তিত্ব, তীব্র দেশপ্রেম দুর্জয় সাহস ফুটে উঠেছে। তিনি সংসদে যে ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন তার কিছু অংশ এখানে তুলে ধরা হল।

''কোন ব্যক্তিগত কারণ আমাকে পদত্যাগ করতে প্রণোদিত করেনি, এবং আমি আশাকরি, যাদের সঙ্গে আমার মতান্তর হয়েছে তারাও আমার এই Conviction কে সমর্থন করবেন।....আমার মতান্তরের কারণ সম্পূর্ণ মৌলিক এবং আমি মনে করি, যে সরকারের নীতি আমি অনুমোদন করি না সেই সরকারের একজন সদস্য হয়ে থাকা অনুচিত এবং অসম্মানজনক।

''পাকিস্তানের প্রতি এই সরকারের গৃহীত নীতি আমি কোনদিনই মেনে নিতে পারিনি। এ হল দুর্বল, খোঁড়া, আত্মবিরোধী। আমাদের ভালমানুষি ও নিষ্ক্রিয়তাকে পাকিস্তান আমাদের দুর্বলতা ঠাউরেছে। ফলে দিনে দিনে পাকিস্তান আপসবিরোধী হয়ে উঠেছে। পাকিস্তান আমাদের জন্য শুধু সমস্যাই তৈরী করছে না, দেশের মানুষের কাছেও আমাদের খেলো করে তুলছে প্রতিটি ব্যাপারেই আমরা রক্ষণাত্মক ভূমিকা নিয়েছি এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রত্যুত্তর দিতে ব্যর্থ হয়েছি। যদিও আমি এখানে ভারত পাকিস্তানের সাধারণ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে চাইছি না, কারণ আমার পদত্যাগের প্রাথমিক এবং প্রধান কারণ পাকিস্তানে বিশেষকরে পূর্ব পাকিস্তানে (আজ যা বাংলাদেশ নামে পরিচিতি) সংখ্যালঘুদের প্রতি ব্যবহার। আমি পরিষ্কার করে বলতে চাই যে, পশ্চিম বাংলার সমস্যা শুধুমাত্র রাজ্যের সমস্যা নয়, বরং সমগ্র দেশের সমস্যা...। পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের সঙ্গে ভারতের সংখ্যালঘুদের একটি মৌলিক পার্থক্য আছে। ভারতের মুসলমান জনসংখ্যার বেশীর ভাগই ধর্মের

ভিত্তিতে দেশ ভাগ চেয়েছে। যদিও অল্প সংখ্যক মুসলমান জাতির স্বার্থের সঙ্গে নিজেদের মিলিয়ে দিয়েছেন এবং এর জন্য কষ্ট ভোগ করেছেন। অন্যদিকে সমস্ত হিন্দুই দেশভাগের বিরোধিতা করেছে। কিন্তু যখন দেশভাগ অবসম্ভাবী হয়ে উঠল তখন আমি নিজে বাংলা ভাগ করার পক্ষে জনসমর্থন সংগ্রহে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলাম। কারণ আমি জানতাম, এ না হলে সমগ্র বাংলা, এমনকি অসমও পাকিস্তানে চলে যেত। ... আমি পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের আশ্বাস দিয়েছিলাম যে যদি তারা ভবিষ্যতে কখনও পাকিস্তান সরকারের দ্বারা অত্যাচারিত হয়, যদি তাদের নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়, যদি তাদের জীবন ও সম্মানের উপর কোন অবিচার নেমে আসে তবে স্বাধীন ভারতবর্ষ ও তার নাগরিকরা অলস দর্শক হয়ে বসে থাকবে না। কিন্তু গত ২১/২ বছর ধরে তাদের উপর অসহনীয় দুঃখজনক কষ্টের ঝড় বয়ে গেছে। আমার স্বীকার করতে বাধা নেই যে, আমার একার আপ্রাণ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও - আমি আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পারিনি। তাই সরকারে থাকার কোন নৈতিক অধিকার আমার নেই। .... আমাদের এটা ভুললে চলবে না যে পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুরা শুধু মানবিকতার দাবি নিয়েই আমাদের সাহায্য পেতে পারে তা নয়, বরং তারাই নিজেদের স্বার্থ উহ্য রেখে হাসি মুখে সমস্ত দুঃখ কষ্ট সহ্য করে ভবিষ্যত ভারতের ভিত্তি গড়েছে।

"আমি মনে করি, এই চুক্তি (নেহরু-লিকায়ৎ চুক্তি) মূল সমস্যার বিন্দুমাত্র সমাধান করবে না।...ওই দেশ থেকে সমস্ত হিন্দু ও শিখকে তাড়িয়ে দিয়ে এবং তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে একই ধর্মাবলম্বীদের নিয়ে ইসলামিক রাজ্য গড়ে তোলা পাকিস্তানের জাতীয় নীতি। এই নীতির ফলে পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের জীবন হয়ে দাঁড়িয়েছে 'nasty, brutish and short'। আমাদের ইতিহাসের শিক্ষা ভুলে যাওয়া উচিত নয়।...যদি কেউ পাকিস্তান সৃষ্টির ইতিহাস স্মরণ করেন তবে বুঝতে পারবেন যে সেখানে হিন্দুদের পক্ষে সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। সমস্যাটা সাম্প্রদায়িক নয় প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক। এই চুক্তি দুঃখজনক ভাবে ইসলামিক রাষ্ট্রের অর্থ কি হতে পারে তা এড়িয়ে গেছে। কিন্তু যে কেউ একটু খেয়াল করলেই দেখতে পাবেন যে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী এক জায়গায় যেমন 'Protection of minority right' এর কথা বলেছেন আবার অন্য জায়গায় দ্ব্যার্থহীন ভাষায় ঘোষণা করছেন যে

"the principles of democracy, freedom, equality, tolerance and special justice as enunciated by Islam shall be fully observed."

"পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীই আবার পাক সংবিধান সভায় বলছেন, 'ইসলাম শুধুমাত্র ব্যক্তিগত বিশ্বাস এবং আচার আচরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। প্রকৃতপক্ষে ইসলামে দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা এবং তা প্রতিকারের উপায় বিশেষভাবে নির্দিষ্ট।

"আমি গুরুত্ব সহকারে এই প্রশ্ন উত্থাপন করতে চাই, এই ধরণের সমাজে কোন হিন্দু কি তার সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার নিয়ে নিরাপদ বোধ করতে পারে?

"...আজ সবচাইতে বড় প্রশ্ন, সংখ্যালঘুরা কি সামান্যতম নিরাপত্তার আশ্বাস নিয়ে পাকিস্তানে বসবাস করতে পারবে? দেশে বা বিদেশে কি প্রতিক্রিয়া হল তা এই চুক্তির বিচারের মাপকাঠি নয়। পাকিস্তানের সেই হতভাগ্য সংখ্যালঘুরা বা যারা ইতিমধ্যে পালিয়ে এসেছে তাদের মনের উপর এই চুক্তির প্রতিক্রিয়াই এই চুক্তির মাপকাঠি।

"যদি এই চুক্তি সাফল্য লাভ করে, অন্য কিছুই তাহলে আমাকে এর থেকে বেশী খুশী করতে পারবে না। কিন্তু যদি এই চুক্তি ব্যর্থ হয় তবে খুবই দুঃখজনক পরিণতি হবে। যাঁরা এই চুক্তিকে সমর্থন করছেন তাঁদের কাছে আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ মিনতি, আপনারা পূর্ব পাকিস্তানে যান, একলা নয়, স্ত্রী, ভগ্নি ও কন্যাদের নিয়ে গিয়ে ওখানে সাহসের সাথে হতভাগ্য হিন্দু সংখ্যালঘুদের সঙ্গে বসবাস করুন। তবেই তো হবে এই চুক্তির প্রতি আপনাদের বিশ্বাসের সত্যিকারের পরীক্ষা...।"

পূর্বপাকিস্তানের হিন্দুদের নিরাপত্তার দাবিতেও নেহরু-লিকায়ৎ চুক্তির প্রতিবাদে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পার্লামেন্টে যে ঐতিহাসকি ভাষণটি দিয়েছিলেন তা এখানে সম্পূর্ণ তুলে দিলাম।

I have never felt happy about our attitude towards Pakistan. It has been weak, halting and inconsistent. Our goodness or inaction has been interpreted as weakness by Pakistan. It has made Pakistan more and more intrasnsigent and has made us suffer all the greater and even lowered us in the estimation of our own people. On every important occasion we have remained on the defensive and failed to expose or counteract the designs of Pakistan aimed at us. I am not, however dealing today with general India-Pakistan relationship, for the circumstances that have led to my resignation

are primarily concerned with the treatment of Bengal problem, is not a provincial one. It raises issues of an all-India character and on its proper solution will depend the peace and prosperity, both economic and political, of the entire nation. There is an important differece in the approach to the problem of minorities in India and Pakistan. The vast majority of Muslims in India wanted the partition of the country on a communal basis, although I gladly recognise there has been a small section of patriotic Muslims who consistently have identified themselves with national interests and suffered for it. The Hindus on the other hand were almost to a man definitely opposed to partition. When the partition of India became inevitable, I played a very large part in creating public opinion in favour of the partition of Bengal, for I felt that if that was not done, the whole of Bengal and also perhaps Assam would fall into Pakistan. At that time little knowing that I would join the first Central Cabinet, I along with others, gave assurances to the Hindus of East Bengal, stating that if they suffered at the hands of the future Pakistan Government, if they were denied elementary rights of citizenship, if their lives and honour were jeopardised or attacked, Free India would not remain an idle spectator and their just cause would be boldly taken up by the Government and people of India. During the last $2^1/_2$ years their sufferings have been of a sufficiently tragic character. Today I have no hesitation in acknowledging that inspite of all efforts on my part, I have not been able to redeem my pledge and on this ground alone-if none other-I have no moral right to be associated with Government any longer. Recent happenings in East Bengal have however overshadowed all their past woes and humiliation. Let us not forget that the Hindus of East Bengal are entitled to the protection of India, not on humanitarian consideration alone, but by virtue of their sufferings and sacrifices, made cheerfully for generations, but for laying the foundations of India's political freedom and intellectual progress It is the united voice of the leaders that are dead and of the youth that smilingly walked upon the gallows for India's cause that calls for justice and fairplay at the hands of Free India of today.

"The recent Agreement, to my mind, offers no solution to the basic problem. The evil is far deeper and no patchwork can lead to peace. The establishment of a homogeneous Islamic State is Pakistan's creed and a planned extermination of Hindus and Sikhs and expropriation of their properties constitute its settled policy. As a result of this policy, life for the minorities in Pakistan has become nasty", brutish and shor" Let us not be forgetful of the lessons of history. We will do so at our own peril. I am not taking of by-gone times, but if anyone analyses the course of events in Pakistan since its creation, it will be mainfest that there is no honourable place for Hindus within that State. The problem is not communal. It is

essentially political. The Agreement unfortunately tries to ignore the implications of an Islamic State. But anyone, who refers carefully to the Objectives Resolution passed by the Constituent Assembly of Pakistan and to the speech of its Prime Minister, will find that while talking in one place of protection of minority rights, the Resolution in another place emphatically, freedom, equality, tolerance and special justice as enunciated by Islam shall be fully observed." The Prime Minister of Pakistan while moving the Resolution thus spoke:

"You would also notice that the State is not to play the part of a natural observer wherein the Muslims may be merely free to profess and practice their religion, because such an attitude on the part of the State would be the very negation of the ideals which prompted the demand of Pakistan and it is their ideals which should be the corner stone of the State which we want to build. The State will create such conditions as are conductive to the building up of a truly Islâmic Society which means that the State will have to play a positive part in this effort. You would remember that the Quaed-e-Azam and ether leaders of the Muslim League always made unequivocal declarations that the Muslim demand for Pakistan was based upon the fact that the Muslims had their own way of life and a code of conduct. Indeed, Islam lays down specific directions for social behaviour and seeks to guide society in its attitude towards the problems which confront it day to day. Islam is not just a matter of private beliefs and conduct."

"In such a Society, let me ask in all seriousness, can any Hindu expect to live with any sense of security in respect of his cultural, religious, economic and political rights. Indeed our Prime Minister analysed the basic difference between India and Pakistan only a few weeks ago on the floor oi the House and his words will bear repetition.

"The people of Pakistan are of the same stock as we are and have the same virtues and failings. But the basic difficulty of the situation is that the policy of a religious and communal Slate followed by the Pakistan Government inevitably produces a sense of lack of full citizenship and a continuous insecurity among those who do not belong to the majority community."

It is not the ideology preached by Pakistan that is the only disturbing factor. Its performances have been in full accord with its ideology and the minorities have had bitter experiences times without number of the true character and functioning of an Islamic State. The Agreement has totally failed to deal with this basic problem.

"Public memory is sometimes very short. There is an impression in many quarters that the Agreement recently made is the first great attempt of

its kind to solve the problem of minorities. I am leaving aside for the time being the disaster that took place in the Punjab; in spite of all assurances and undertakings there was a complete collapse of the administration and the problem was solved in a most brutal fashion. Afterwards we saw the gradual extermination of Hindus from the North Western Frontier Province and Baluchistan and latterly from Sind as well. In East Bengal about 13 millions of Hindus were squeezed out of East Bengal. There were no major incidents as such; but circumstances so shaped themselves that they got no protection from the Government of Pakistan and were forced to come away to West Bengal for shelter. During that period there was no question of any provocation given by India where normal conditions had settled down; there was no question of Muslims being coerced to go away from India to Pakistan. In April, 1948, the First Inter-Dominion Agreement was reached in Calcutta, dealing specially with the problems of Bengal. If anyone analyses and compares the provisions of that Agreement with the recent one it will appear that in all essential matters they are similar to each other. This Agreement, however, did not produce any effective result. India generally observed its terms but the exodus from East Bengal continued unabated. It was a oneway traffic, just as Pakistan wished for. There were exchanges of correspondence; there were meetings of officials and Chief Ministers; there were consultations between Dominion Ministers. But judged by actual results Pakistan's attitude continued unchanged. There was a second Inter-Dominion Conference in Delhi, in December, 1948, and another Agreement was signed, sealed and delivered. It dealt with the same problem-the rights of minorities specially in Bengal. This also was a virtual repetition of the first Agreement. In the course of 1949 we witnessed a further deterioration of conditions in East Bengal and an exodus of a far larger number of helpless people, who were uprooted from their hearth and home and were thrown into India in a most miserable condition. The fact thus remains that inspite of two Inter-Dominion Agreements as many as 16 to 20 lakhs of Hindus were sent away to India from East Bengal. About a million of uprooted Hindus had also to come away from Sind. During this period a large number of Muslims also came away from Pakistan mainly influenced by economic considerations. The economy of West Bengal received a rude shock and we continued as helpless spectators of a grim tragedy.

Today there is a general impression that there has been failure both on the part of India and Pakistan to protect their minorities. The fact however is just the reverse of it. A hostile propaganda has been also carried on in some sections of the foreign press. This is a libel on India and truth must be made known to all who desire to know it. The Indian Government - both at the

Centre and in the Provinces and States - generally maintained peace an
security throughout the land after Punjab and Delhi disturbances ha
quietened down, inspite of grave and persistent provocations from Pakistan
by reason of its failure to create conditions in Sind and East Bengal whereby
minorities could live there peacefully and honourably. It should not be
forgotten here that the people who came from East Bengal or Sind were no
those who had decided to migrate to India out of imaginary fear at the time o
partition. These were people who were bent on staying in Pakistan, if only
they were given a chance to live decent and peaceful lives.

" Towards the end of 1949, fresh events of a violent character starte
happening in East Bengal. On account of the iron curtain in that area, new
did not at first arrive in India. When about 15,000 refugees came to Wes
Bengal in January 1950, stories of brutal atrocities and persecutions came t
light. This time the attack was directed both against middle class urba
people and selected sections of rural people who were strong, virile an
united, to strike terror into their hearts was a part of Pakistan's policy. Thes
startling reports led to some repercussions of a comparatively mino
character in certain parts of West Bengal. Although these were checke
quickly and effectively, false and highly exaggerated reports of so-calle
occurrences in West Bengal were circulated in many parts of East Bengal
This was clearly done with official backing and with a sinister motive. In th
course of two to three weeks events of a most tragic character, which n
civilized Government could ever tolerate, almost simultaneously broke ou
in numerous parts of East Bengal, causing not only wanton loss of lives an
properties, but resulting also in forcible conversion of a large number o
helpless people, adduction of women and shocking outrages on them
Reports which have now reached our hands clearly indicate that all thes
could not have happened as stray sporadic incidents. They formed part of
deliberate and cold planning to exterminate minorities from East Bengal, t
ignore this is to forget hard realities. During that period our publicity bot
here and abroad became hopelessly weak and ineffective. This was partl
done in order to prevent repercussions within India. Pakistan howeve
followed exactly the opposite course of action. The result was that we wer
dubbed as aggressors while the truth was the reverse of it. During thes
critical weeks – although there were people who were swayed by passion
and prejudices – vast sections of India's population were prepared to leav
matters in the hands of Government and expected it to take stubbor
measures to check the; brutalities perpetrated in Pakistan. At that hour o
crisis we failed to rise equal to the occasion. Where days - if not bourse
counted, we allowed weeks-to go by and we could not decide what was th

right course of action. The whole nation was in agony and expected promptness and firmness, but we followed a policy of drift and indecision. The result was that in some areas of West Bengal and other parts of India, people became restive and exasperated and took the law into their own hands. Let me say without hesitation that private retaliation on innocent people in India for brutalities committed in Pakistan offers us no remedy whatsoever. It creates a vicious circle which may be worse than the disease; it brutalizes the race and lets loose forces which may become difficult to control at a later stage. We must function as a civiisised State and all citizens who are loyal to the State must have equal rights and protection irrespective of their religion or faith. The only effective remedy in a moment of such national crisis can and must be taken by me Government of the country and if Government moves quickly, consistent with the legitimate wishes of the people and with a full sense of national honour and prestige, there is not the least doubt that the people will stand behind the government. In any case, Government acted promptly to re-establish peace and order throughout India. Meanwhile Muslims, though in much lesser number, had also started leaving India, a good number of whom belonged to East Bengal and had come to West Bengal for service or occupation. Pakistan realished the gravity of the situation only when it found that on this occasion, unlike previous ones, there was no question of one way traffic. Since January last at least 10 lakhs of people have come out of East Bengal to West Bengal. Several lakhs have gone to Tripura and Assam. Reports indicate that thousands are on their march to India today and they represent all classes and conditions of people.

The supreme question of the hour is, can the minorities continue to live with any sense of security in Pakistan? The test of any Agreement is not its reaction within India or in foreign lands, but on the minds of the unfortunate minorities living in Pakistan or those who have been forced to comy away already. It id not how a few top-ranking individuals in Pakistan think or desire to act, it is the entire set-up of that State the mentality of the official circles high and low-the attitude of the people at large and the activities of organisations such as 'Ansars' which all operate together and make it impossible for Hindus to live. It may be that for some monthss no major occurrences may take place. Meanwhile we may on our generosity supply them with essential commodities which will give them added strength. That has been Pakistan's technique. Perhaps the next attack may come during the rainy season when communications are virtully cut off.

"I have, found myself unable to be a party to the Agreement for the following main reasons :

First we had two such Agreements since Partition for solving the Bengal Problem and they were violated by Pakistan without any remedy open to us. Any Agreement which has no sanction will not offer any solution.

Secondly - the crux of the problem is Pakistan's concept of an Islamic State and the ultra communal Administration based on it. The Agreement sidetracks this cardinal issue and we are today exactly where we were previous to the Agreement.

Thirdly - India and Pakistan are made to appear equally guilty while Pakistan was clearly the aggressor. The Agreement provides that no propaganda will be permitted against the territorial integrity of the two countries and there will be no incitement to war between them. This almost sounds farcical so long as Pakistan troops occupy a portion of our territory of Kashmir and warlike preparations on its part are in active operation.

"Fourthly - events have proved that Hindus cannot live in East Bengal on the assurances of security given by Pakistan. We should accept this as a basic proposition. The present Agreement on the other hand calls upon minorities to look upon Pakistan Government for their safety and honour which is adding insult to injury and is contrary to assurances given by us previously.

Fifthly - there is no proposal to compensate those who have suffered nor will the guilty be ever punished, because no one will dare give evidence before a Pakistan Court. This is in accordance with bitter experience in the past.

Sixthly - Hindus will continue to come away in large numbers and those who have come will not be prepared to go back. On the other hand, Muslims who had gone away will now return and in our determination to implement the Agreement. Muslims will not leave India. Our economy will thus be shattered and possible conflict within our country will be greater.

Seventhly - in the garb of protecting minorities in India, the Agreement has reopened the problem of Muslim minority in India, Urns seeking to revive those disruptive foices that created Pakistan itself. This principle carried to its logical conclusions, will create fresh problems for us which, strictly speaking, are against our very Constitution.

This is not the time nor the occasion for me to discuss alternative lines of action. This must obviously wait until the results of the policy now adopted by Government are known. I do not question the motives of those who have accepted the Agreement. I only hope that the Agreement must not be unitaterally observed. If the Agreement succeeds, nothing will make me happier. If it fails, it will indeed be a very costly and tragic experiment. *I would only respectfully urge those who believe in the Agreement to discharge their responsiblity by going to East Bengal - not alone, but accompanied by their wives sisters and daughters and bravely share the*

burden of joint living with the unfortunate Hindu minorities of East Bengal. That would be a real test of their faith. While I have differed from the line of approach adopted by our Government to solve a malady which perhaps has no parallel in history, let me assure the House that I fully agree that the supreme need of the hour is the maintenance of peace and security in India. While utmost pressure can and must be put upon the Government of the day to act rightly, firmly and timely to prevent the beneful effects of appeasement and to guard against the adoption of a policy of repression, no encourgement should be given to create chaos and confusion within our land. If Government is anxious to have another chance - and let us understand it clearly that this is the last chance that it is asking for - by all means, let Government have it. But let not the critics of Government policy be silenced or muzzled. To our misfortune, one of the parties to the Agreement has systematically broken its pledges and promises and we have no faith in its capacity to fulfil its future pledges, unless it shows by actual action that it is capable of so doing. This note or warning sounded by us should not be unwelcome to Government, for it will then act with more keennes and alertness and not permit the legitimate interesrs of India to be sacrificed or sabotaged in any way.

While dealing with the problem of refugees, we will have to consider also the stupendous task of rehabilitation. The present truncated province of West Bengal cannot simply bear this colossal burden. It is a mighty task where both official and non-official elements can work together for the larger good of the country and between Government and its critics there will always be ample room for co-operation in facing a problem which concerns the peace and happiness of millions of people and of the advancement of the entire nation."

* * *

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ পদত্যাগ করলেন। আলোড়ন সৃষ্টি হল রাজনৈতিক মহলে। সমগ্র দেশজুড়ে প্রশ্নের বন্যা? তবে কি শ্যামাপ্রসাদ রাজনীতি ছেড়ে দিলেন? কারণ তিনি তাঁর পদত্যাগ ভাষণে উদ্বাস্তু পুনবার্সনে আত্মনিয়োগ করার কথা বলেছেন। অনেকেই প্রশ্ন তুললেন, তবে কি জহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে আধিপত্য মেনে নেওয়া হল? ঐ সময় প্রবাদ ছিল যে, দু'জন মানুষকে নেহরু সমঝে চলতেন — কংগ্রেসের ভিতরে লৌহ মানব সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল, কংগ্রেসের বাইরে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। প্যাটেল নেই, তিনি

মারা গেছেন। শ্যামপ্রসাদ? তিনিও নেই সরকারে।

কিন্তু নেহরুকে স্বৈরাচারি মনোবৃত্তি নিয়ে দেশ পরিচালনা করতে দেবেন না ডঃ শ্যামাপ্রসাদ। আগামী দেড় বছর নেহরুর ঘুম কেড়ে নিতে হাজির হলেন নতুন রূপে, নতুন সাজে। শ্যামাপ্রসাদের নেতৃত্বে এক নতুন পার্টির জন্ম হয়েছে —জনসঙ্ঘ। নূতন পার্টির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শ্যামাপ্রসাদ জানালেন, ''কংগ্রেসের শাসনের মধ্যে যে একনায়কতান্ত্রিক মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছে তার অন্যতম প্রধান কারণ দেশে কোন সু-সংগঠিত বিরোধী দল নেই...।' (One of the cheif reasons for the manifestation of dictatorship of Congress rule is the absence of well-organised opposition parties which alone can act as a healthy check on the majority party and can hold out before the country the prospect of an alternative government".

পার্টির গঠন ও চরিত্র সম্পর্কে শ্যামাপ্রসাদ জানালেন যে, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেক ভারতীয় জনসঙ্ঘে যোগ দিতে পারে। আরো বলা হল যে, এই পার্টি ভারতীয় সংস্কৃতিতে ও ভারতীয় মর্যাদায় বিশ্বাস করে।

স্বাভাবিকভাবেই নতুন এই পার্টিকে ভালভাবে নিলেন না নেহরু। হুঙ্কার ছাড়লেন, "I will crush Jana Sangha." জবাব দিলেন শ্যামাপ্রসাদ, "I say, I will cursh this crushing mentality".

জনসঙ্ঘের বিরুদ্ধে রুটিমাফিক অভিযোগ আনলেন নেহরু— ''সাম্প্রদায়িক''। বিতর্কে জড়িয়ে পড়লেন শ্যামাপ্রসাদ, ''স্বাধীনতার আগে মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার বেদীতে বার বার ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে বলি দিয়ে এবং দেশ ভাগের পরেও পাকিস্তান সরকারের খেয়ালের কাছে যিনি আত্মসমর্পণ করছেন, সেই নেহরুর অন্যকে সাম্প্রদায়িক অভিযুক্ত করা মানায় না। এখন একমাত্র নেহরু এবং তাঁর সাকরেদের মুসলমান তোষণ ছাড়া দেশে আর কোন সাম্প্রদায়িকতা নেই। আগামী নির্বাচনে মুসলমান ভোট পাওয়ার আশায় তাঁরা এই নীতি নিয়েছেন। ...... দেশের অন্যান্য সমস্যা থেকে দেশের মানুষের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই সাম্প্রদায়িকতার ধুয়ো তুলেছেন। (The cry of communalism raised by Pandit Nehru is to side-track the real issues now before the country। ভারতবর্ষের মূল সমস্যা ক্ষুধা,

দারিদ্র, শোষণ, অপশাসন, দুর্নীতি। পাকিস্তানের কাছে নির্লজ্জ আত্মসমর্পন এবং এই সমস্ত কিছুর জন্য দায়ী কংগ্রেস ও তার সরকার।”

নেহরু সম্পর্কে শ্যামাপ্রসাদের মূল্যায়ন যথেষ্ট পরিষ্কার এবং মূল্যবান। "when I scan the whole course of Indian history, I do not find a single man, who has done more harm to this country than Pt. Nehru" I

আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে সংসদে ডঃ মুখোপাধ্যায় অঘোষিত বিরোধী নেতার স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। তিনি সেই সময় সংসদে যে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণগুলি দিয়েছিলেন তার কিছু কিছু অংশ এখানে তুলে দেওয়া হল।

প্রথম সংসদের প্রথম অধিবেশনে শ্যামাপ্রসাদ যে বক্তব্য রেখেছিলেন তাতে গণতান্ত্রিক মানসিকতার চরম উৎকর্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। ২১শে মে, ১৯৫২-র সংসদীয় ভাষণে তিনি সমস্ত সাংসদদের আহ্বান জানান, “.... আমরা আদর্শগতভাবে বিভিন্ন মত ও পথের পথিক হলেও একটি বিষয়ে আমাদের প্রত্যেকের ধ্যান ধারণা এক (one idea alone)। আমরা প্রত্যেকেই চাই এই স্বাধীনতাকে ফলপ্রসূ করে তুলতে এবং সমস্ত দেশবাসীর উন্নতি করতে। .....আমরা যে যে মতেরই হই না কেন, তাতে কিছু আসে যায় না(no matter to which group of party we may belong), আসুন আমরা সমস্যাগুলিকে ব্যাপকতার অর্থে দেখি এবং নিজেদের পার্থক্যগুলি দূর করে এমন কিছু করি যাতে দেশের উন্নতি হয়। আমরা যদি আমাদের নিজেদের পার্থক্যগুলিই মিটিয়ে নিতে না পারি তো দেশের সামনে বিকল্প কি থাকবে? .... প্রাচীনদের মতো এখানেও যদি সংখ্যাধিক্যের জোরে অত্যাচার ও একনায়কতান্ত্রিক মনোভাব বিকশিত হয়, যদি আমরা অপরের মতকে স্বীকার না সহ্য করতে না পারি, যা গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়, তবে দেশের সামনে একমাত্র বিকল্প থাকবে অনাচার (chaos)।

কংগ্রেসের প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটন করে তিনি বলেন, “রাষ্ট্রপতির ভাষণে যে সাম্প্রদায়িকতা, জাতিভেদ এবং প্রাদেশিকতাকে নিন্দা করা হয়েছে, সেগুলির সবকটিকে কংগ্রেস নির্বাচনে সাফল্য লাভের চাবিকাঠি করছে।”

নেহরুর কাশ্মীর নীতির তীব্র সমালোচনা করেন শ্যামাপ্রসাদ। ক্ষিপ্ত নেহরু

শ্যামাপ্রসাদের ভাষণের মাঝেই চিৎকার করে ওঠেন, "I know more about kashmir than Mookerji. শ্যামাপ্রসাদ জবাব দেন, "এটাই সবচেয়ে বড় সমস্যা যে প্রধানমন্ত্রী জগতের সবকিছুই সকলের থেকে বেশী জানেন এবং তিনি কারো পরামর্শ নেন না। এটা যদি তাঁর মনোভাব হয় তবে সংসদের কাজ কিভাবে চলতে পারে? আমি কোন সাজেস্‌ন দিলেই তিনি বলেন, 'আমি আপনার থেকে বেশী জানি', নিশ্চয়ই তিনি আমার থেকে অনেক বেশী জানেন। তবু আমি কিছু সাজেশ্‌ন দিলে তাঁকে তা বিবেচনা করতেই হবে।

"আমি জানতে চাই, কাশ্মীরীরা প্রথমে ভারতীয়, পরে কাশ্মীরী, না প্রথমে কাশ্মীরি, পরে ভারতীয় (are kashmirls Indian first and kashmiri next, or they are kashmiris first and Indian next, or they are kashmiris first, second and third and not Indian at all)। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং আমাদের অবশ্যই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।"

বাংলার উদ্বাস্তু সমস্যা কংগ্রেস নেতৃত্ব কোনদিনই গুরুত্ব সহকারে দেখেননি। বরং বাংলার প্রতি এক ধরণের sadist মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে তাঁদের নীতি নির্ধারণে। অহিংসার পূজারী স্বয়ং গান্ধী নেহরুকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান থেকে হিন্দু বার বার বোঝাতে চেয়েছেন যে পূর্ব-পাকিস্তানে বাঙ্গালী হিন্দুরা খুব ভাল আছেন এবং উদ্বাস্তু স্রোত বলে যা প্রচার করা হচ্ছে তা সবই কল্পনাপ্রসূত। নিজের এই দাবির সপক্ষে নেহরু সংসদে যে ভাষণ দেন শ্যামাপ্রসাদ তাকে মিথ্যা বলে অভিহিত করেন। এই প্রসঙ্গে দু'জনের বিতর্কের কিছু অংশ এই রকম ঃ

নেহরু ঃ আমার বক্তব্য মিথ্যা?

শ্যামাপ্রসাদ ঃ আলবৎ অসত্য।

নেহরু ঃ আমি যদি সমস্ত তথ্য এবং সংখ্যা place করি।

শ্যামাপ্রসাদ ঃ প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য এবং তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভুল। ..... তিনি হয়তো সরকারি মুখপাত্র থেকে জেনেছেন। এর জন্য তাঁকে দোষ দিচ্ছি না। কিন্তু যদি সংসদের কোন সদস্য দাঁড়িয়ে বলেন যে তাঁর কাছে খবর আছে যে উদ্বাস্তুরা চলে আসছেন, যে কোন দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন প্রধানমন্ত্রীর তখন দাঁড়িয়ে বলা উচিত

'আমরা বিষয়টা দেখছি এবং কি ভাবে এর সমাধান করা যায় তার উপায় বের করছি।'

নেহরু ঃ সম্মানীর সদস্য আমার বক্তব্য চ্যালেঞ্জ করছেন।

শ্যামাপ্রসাদ ঃ এই চ্যালেঞ্জ কাউন্টার-চ্যালেঞ্জ সম্পূর্ণ অধিবেশনেই চলবে।

বাজেট বিতর্কের উপর বলতে উঠে শ্যামাপ্রসাদ বলেন, "প্রধানমন্ত্রী গতদিন বলেছেন যে আমরা যা করেছি তাতে বিদেশীরা সরকারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হচ্ছে। নিশ্চিতভাবেই কিছু সাফল্য এসেছে যার কৃতিত্ব সরকারের পাওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের শুধু এটা ভাবলেই চলবে না মিসেস রুশভেল্ট কি বললেন, বাট্র্যান্ড রাসেল কি বললেন, কিংবা অন্য কোন অভিজাত মহিলা কি বললেন। আমাদের দেখা উচিত যে আমার দেশের মানুষ কি বলছে। যদি আপনি ন্যায্য দামে জনসাধারণের কাছে খাবার পৌঁছে দিতে না পারেন, যদি অসুখ এবং দারিদ্র দেশে শিকড় ছড়িয়ে বসে থাকে, তবে আপনার সরকারে থাকার প্রয়োজনীয়তার অর্থই শেষ হয়ে যাবে। আপনাকে ভীতি প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে একথা বলছি না। আসুন এই ব্যাপারে আমরা সবাই দলীয় স্বার্থের উপরে উঠি।"

সরকারের আনা নিবারণমূলক আটক বিল (Preventive Detention Bill) - এর তীব্র বিরোধিতা করে শ্যামাপপ্রসাদ দাবি করেন যে, এই বিল "its repugnant to any democratic constitution in any part of the civilised world..."।"

তবে কি শ্যামাপ্রসাদ 'অন্ধ নেহরু বিরোধী?' সংসদে তাঁর ভাষণে শ্যামাপ্রসাদ দাবি করেছেন, "আমাদের বিরুদ্ধে যা-ই বলা হোক না কেন, আমাদের যে বদনাম-ই দেওয়া হোক না কেন, আমি প্রধান মন্ত্রীকে এ বিষয়ে নিশ্চিত আশ্বাস দিতে পারি যে যদি দেশে কোন জরুরী প্রয়োজন দেখা দেয়, আমি এবং আমার দল নিঃস্বার্থভাবে সরকারের পাশে থাকবে এবং সমর্থন যোগাবে" (I offer our unconditional allegiance and support to the Government)।

'Opposition for the sake of opposition' নীতিতে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ

মুখোপাধ্যায় বিশ্বাস করতেন না। সরকারে প্রতি তাঁর সমালোচনা ছিল সম্পূর্ণ গঠনাত্মক। এই বিষয়ে কম্যুনিস্টদের চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির যে বিশাল ফারাক ছিল নিচের বিতর্ক থেকে তার কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে। সংসদে রেল বাজেটের উপর বলতে গিয়ে কম্যুনিস্ট সংসদীয় দলের ডেপুটি লিডার হীরেন মুখার্জী ও শ্যামাপ্রসাদের উপভোগ্য তর্ক-বিতর্কের কিছু অংশ এইরকম ঃ

হীরেন মুখার্জী ঃ রেল ইঞ্জিনের সমস্ত যন্ত্রাংশ চিত্তরঞ্জন বানাচ্ছে না।

শ্যামাপ্রসাদ ঃ আমার সম্মানীয় বন্ধু সম্ভবত জানেন না যে পৃথিবীর কোন দেশেই রেল ইঞ্জিনের একশ শতাংশ যন্ত্রাংশ বানায় না।

হীরেন মুখাজী ঃ এই রকম অনেক দেশ আছে।

শ্যামাপ্রসাদ ঃ হয়তো এইরকম দেশটা রাশিয়া এবং ওই দেশটা সম্পর্কে আমার বন্ধু আমার থেকে অনেক বেশী জানেন। যাইহোক, এই মুহূর্তের জন্য সমস্যাটা রুশ চোখ দিয়ে না দেখে ভারতীয় চোখ দিয়ে দেখা যাক।

অতএব স্বাভাবিকভাবেই প্রবাদ হয়ে উঠলেন শ্যামাপ্রসাদ। এডম্যান্ড বার্কের ভারতীয় সংস্করণকে স্বীকৃতি জানানো হল, "Dr. Mookherji rules the Parliament though Pandit Nehru may rule the country".

কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ তো তাঁর কর্মযজ্ঞ সংসদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে আসেননি। তাঁর সাধনা আরো ব্যাপক, তিনি চান শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ 'সুজলাং সুফলাং' এক ভারতবর্ষ। কিন্তু ঐক্যবদ্ধ ভারতের পক্ষে সবচেয়ে বড় বাধা জম্মু-কাশ্মীর। শক্তিশালী ভারতের সবচেয়ে বড় শত্রু নেহরুর ক্লীবত্ব।

১৯৪৭ সালের ২৬শে অক্টোবর জম্মু-কাশ্মীর ভারতেযোগদান করে। এই যোগদান ছিল সম্পূর্ণ নিঃশর্ত। কিন্তু আগ বাড়িয়ে নেহরু হঠাৎ কাশ্মীরের জন্য বিশেষ কিছু সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। প্রস্তাব দেওয়া হয়, কাশ্মীরের জন্য আলাদা আইন, অলাদা পতাকা এবং আলাদা প্রধানমন্ত্রী থাকবেন। এই প্রস্তাবকে পাকাপাকি রূপ দেওয়ার জন্য সংবিধানে ৩৭০ ধারা বলে একটি বিশেষ ধারাও সংযুক্ত করা হয়। শ্যামাপ্রসাদ এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন। তাঁর সিংহ গর্জন "এক প্রধান, এক বিধান, এক নিশান" সমস্ত

দেশে ধ্বনিত হতে থাকে। সেই সময় কাশ্মীর যেতে পারমিট লাগত। অর্থাৎ সরকারী অনুমতি নিয়ে তবেই কাশ্মীরে যাওয়া যেত। শ্যামাপ্রসাদ নিজে এই পারমিট প্রথা ভেঙ্গে কাশ্মীরে যাওয়ার সঙ্কল্প নেন্। এই প্রসঙ্গে নেহরুকে লেখা শ্যামাপ্রসাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি এখানে উল্লেখের দাবি রাখে —

"আমি আপনাকে পরিষ্কার জানিয়ে দিতে চাই যে আপনার ক্রোধ এবং আক্রোশের সমস্ত রকম পরিণতির সম্মুখীন হতে আমরা প্রস্তুত। গতকাল পাঞ্জাবে নিবারণমূলক আটক আইনে আমাদের কর্মীদের গ্রেপ্তার করে আপনি বুঝিয়ে দিয়েছেন যে কি হতে চলেছে। আমাদের দেশের গণতন্ত্রের এক অদ্ভুত প্রতিফলন আপনার কাছে দেখা গেল যেখানে আইনসিদ্ধ রাজনৈতিক বিরোধিতা দমন করতে নিবারণমূলক আটক আইন প্রয়োগ করা হল।

"আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন যে আপনার মতো কাশ্মীর সমস্যার আন্তর্জাতিকরণ ব্যাপারটা আমি বুঝতে ব্যর্থ হয়েছি। তবে এই দাবি কোন একজনও করবে না যে আপনার কাশ্মীর নীতি পরিচালনা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমাদের সম্মান একটুও বাড়িয়েছে অথবা বিপুল আন্তর্জাতিক সমর্থন আমরা পেয়েছি। .....আমাদের মধ্যে নীতিগত বিরোধ থাকলেও আমরা একই মায়ের দুই সন্তান। ....আসুন, দেশের বৃহত্তর স্বার্থের কথা চিন্তা করে আমরা সমস্ত রকম মর্যাদার লড়াই থামিয়ে এই সমস্যার একটা সুষ্ঠু সমাধানের চেষ্টা করি।

* * *

শ্মশান থেকে সোজা বাড়ি ফিরে আসে বাদল। পার্টি অফিসে যেতে বলেছিল মাণিক, কিন্তু যায়নি। সব যেন কেমন শূন্য হয়ে গেল। আলোটা নিবিয়ে অন্ধকার ঘরে চোখ বুজতে চেষ্টা করে। দুদিন ধরে এক সেকেন্ডের জন্যও বিশ্রাম পায়নি চোখ দু'টো। কিন্তু পারে না। সমস্ত স্মৃতিগুলো ভেসে ওঠে। এত স্পষ্ট যে সহ্য করা যায় না। অন্ধকারেই বোধহয় স্মৃতির ছবিগুলো বেশী তীব্র হয়। মা'কে ডাকে বাদল। আলোটা জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্য। আলোকিত ঘরে হঠাৎ দেওয়ালের দিকে দৃষ্টি চলে যায়। একটা ছবি। বাবা টাঙ্গিয়েছেন যত্ন করে। কেমন যেন হঠাৎ মাথার উপর রক্ত চড়ে বসে। পাগলের মতো টেনে হিঁচড়ে কাঁচের ফ্রেমে বাঁধানো ছবিটা নামায় বাদল, তারপর সজোরে ছুঁড়ে মারে মেঝেতে।

রুদ্ধ হয়ে থাকা কান্নাটা বেরিয়ে আসে এবার। শব্দ শুনে বাবা ছুটে এসেছেন। ছেলেকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছেন মা। মেঝেতে নির্বাক হয়ে পড়ে আছে কাঁচ ভাঙ্গা গান্ধীর ছবিটা। চিৎকার করে ওঠে বাদল, "এই লোকটাই শ্যামাপ্রসাদের খুনী; ভন্ড, প্রতারক, hypocrite একটা।"

নিজের বিবেকের কাছে বাদল পরিষ্কার। কোন অন্যায় করেনি গান্ধীর ছবি ভেঙ্গে। নেহরুর রাজনৈতিক গুরু তো গান্ধী। জিন্নাকে রাজনীতির পাদপ্রদীপে এনেছেন তো ওই মানুষটাই। প্যাটেল প্রধানমন্ত্রী হলে কাশ্মীরে সমস্যার সৃষ্টি হতো না। কিন্তু বেশীরভাগ রাজ্য কংগ্রেস কমিটির তরফ থেকে সর্বভারতীয় কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট এবং দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে প্যাটেলের নাম সুপারিশ হওয়া সত্ত্বেও গান্ধীর চক্রান্তেই তা বাস্তবায়িত হয়নি। 'তবে কেন গান্ধীর ছবি থাকবে ঘরে? কেন?' হৃদয় নিংড়ে সমস্ত কান্নাটা বেরিয়ে আসে যেন।

একই প্রশ্ন করেছিলেন নাথুরাম গডসে। কেন গান্ধী বেঁচে থাকবেন? কার জন্য? কার কাজে? তাই পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকতেও পালিয়ে যাননি গডসে। রিভলবারে গুলি থাকতেও আত্মহত্যার পথ বেছে নেননি। বরং নিজেই জানিয়েছেন, পালিয়ে যাওয়া বা আত্মহত্যার সুযোগ পেয়েও তিনি তা করেননি কারণ, 'প্রকৃত' গান্ধীকে তিনি উন্মোচন করতে চান। তাই বিচারে নিজের অপরাধ তিনি কখনও অস্বীকার করেননি। বরং আদালতে জানিয়েছেন, "সুরাবর্দী সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে নোয়াখালিতে হিন্দুদের উপর মুসলমানদের অত্যাচার আমার রক্তে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু যখন দেখলাম সেই সুরাবর্দীকে নিয়ে গান্ধীজি তাঁর প্রার্থনাসভাগুলিতে যাচ্ছেন এবং তাঁকে 'শহীদ সাহেব' বলে সম্বোধন করছেন তখন আমার গান্ধীজির প্রতি যে ঘৃণা আর ক্রোধের সৃষ্টি হয়েছিল তা সীমাহীন। শুধু তাই নয়। দিল্লীর ভাঙ্গি কলোনির মন্দিরগুলিতে, সেখানকার হিন্দুদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও গান্ধীজি কোরাণ পাঠ চালু করলেন। কিন্তু কই! মুসলমানদের মসজিদে তো গীতা পাঠ চালু করতে পারলেন না। আসলে গান্ধীজি জানতেন, তা করতে গেলে কি তীব্র মুসলিম প্রতিক্রিয়া তাঁকে সামলাতে হবে। গান্ধীজির ধারণা হয়েছিল যে হিন্দুরা সমস্ত কিছুই মুখ বুজে সহ্য করে যাবে। তাই আমার মনে হলো গান্ধীজির এই ধারণাকে মিথ্যা প্রমাণিত করা উচিত। তাঁকে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত যে হিন্দুদের

সম্মানে আঘাত করলে তারাও প্রতিবাদ করতে পারে।

"লক্ষ কোটি মানুষ তাদের বাড়ি জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে গেল, কিন্তু গান্ধীজি তবুও তাঁর তোষণনীতি চালিয়ে যাচ্ছেন। আমার রক্ত যেন ফুটতে শুরু করল এবং এই মানুষটাকে আমি আর সহ্য করতে পারছিলাম না। ......গান্ধীজি প্রকৃতপক্ষে তাই করেছেন যা বৃটিশরা করেছে, 'Divide and Rule' গান্ধীজি দেশটাকে ভাগ করেছেন।

"গত ৩২ বছর ধরে গান্ধীজির এই তোষণ নীতি আজ পরিপূর্ণ আকার ধারণ করেছে মুসলমানদের জন্য অনশনের মধ্যে। আমি বাধ্য হয়েছি এই সিদ্ধান্তে আসতে যে এখনই গান্ধীজির পরিসমাপ্তি ঘটা প্রয়োজন।

"আমি জানি দেশবাসীর বুকে আমার জন্য সঞ্চিত আছে একরাশ ঘৃণা। ...... তবুও আমি বিশ্বাস করি, এই আদালতের বাইরে যদি কোন আদালত থাকে, সেখানকার বিচারে আমি দোষী সাব্যস্ত হব না। আমি বিশ্বাস করি যে গান্ধীজির মৃত্যুই ভারতবর্ষে এক বাস্তব ও লড়াকু নেতৃত্ব জন্ম দেওয়ার প্রধান শর্ত।"

কিন্তু গডসের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হল না। প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জহরলাল নেহরু; বাস্তব নয়, লড়াকু, তবে দেশের জন্য নয়, নিজের রাজনৈতিক উচ্চাশা পূরণ করতে। এর জন্য যে কোন মূল্য তিনি দিতে রাজী। শান্তির দূত হিসাবে পৃথিবীর ইতিহাসে নিজের নাম বাঁচিয়ে রাখতে চান তিনি। তাই ১৯৬২ সালে যখন চীন তিব্বত দখল করে নেয়, ভারত সরকারের তরফ থেকে তখন এই চীনা আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ তোলা হয়নি। প্রফেসর এন. সি. রঙ্গের তোলা "whether the Prime Minister could be indifferent to the gathering clouds of threats to our safety" প্রশ্নকে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল আমেরিকান সাইকোলজি বলে। বল্লভভাই প্যাটেল এবং ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় চেয়েছিলেন চীনা আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ভারত সরকার কঠোর মনোভাব গ্রহণ করুক। কিন্তু নেহরু 'চীনা ভাইদের' আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে চাননি। বরং শ্যামাপ্রসাদকে Rightist বলে সমালোচনা করা হল কারণ তিনি তাঁর আশঙ্কা ব্যক্ত করেছিলেন যে "India would one day have

to fight China in Tibet". মৃত্যুর কয়েকদিন আগে, ৭ই নভেম্বর নেহরুকে লেখা এক চিঠিতে প্যাটেলও শ্যামাপ্রসাদের আশঙ্কাকে যুক্তিযুক্ত মনে করেছেন। কিন্তু নেহরু নির্বিকার। যেকোন মূল্যে নিজের নাম, খ্যাতি, যশ, প্রতিপত্তি রক্ষা করা চাই।

নেহরু গান্ধীর যোগ্য শিষ্য, কিন্তু প্যাটেল নন। তাই গান্ধী প্যাটেল সম্পর্কে বলতেন, "Patel is a Congressman with Hindu mind" দিল্লীতে পালিয়ে আসা হিন্দু ও পাঞ্জাবী উদ্বাস্তুরা আশ্রয়ের জন্য বেশ কিছু মসজিদ দখল করে নিয়েছিল। গান্ধী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্যাটেলকে নির্দেশ দিয়েছিলেন ওই উদ্বাস্তুদের মসজিদ থেকে বের করে দিয়ে মসজিদ গুলো মুসলমানদের হাতে ফিরিয়ে দিতে। প্যাটেল গান্ধীর এই নির্দেশ মানতে অস্বীকার করেন। এমনকি মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগও করতে চেয়েছিলেন।

বল্লভভাই প্যাটেলের সমস্ত কাজই শ্যামাপ্রসাদ সমর্থন করতেন তা নয়, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দু'জনের মধ্যে মিল ছিল প্রচুর। তাই প্যাটেলের মৃত্যুর পর "Times of India" মন্তব্য করেছিল "mantle of Sardar Petel had fallen on Dr. Shyama Prasad Mookerji." ফলে স্বাভাবিক ভাবেই দুজনই ব্রাত্য হয়েছেন নেহরুপন্থী কংগ্রেসীদের কাছে। কম্যুনিস্টরা দু'জনকেই আখ্যায়িত করেছেন প্রতিক্রিয়াশীল বলে।

কম্যুনিস্টদের সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদের আদর্শগত বিরোধ ছিল আগে থেকেই। কিন্তু '৪৬-এ এই বিরোধ নতুন মাত্রা পেয়েছিল। আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে ১৬ই আগস্ট, ১৯৪৬ মুসলিম লীগ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দিয়েছিল। লীগ নেতা নরুল হুদা ঘোষণা করেছিলেন যে ঐদিন লীগ প্রমাণ করবে যে স্লোগানের যুগ শেষ, এখন শুধু অ্যাকশন। 'No more slogan. The clarion call has come for action, and nothing but action."

আগ বাড়িয়ে লীগের এই 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' কর্মসূচী সমর্থন করে বসল কম্যুনিস্ট পার্টি। ১৫ই আগস্ট ইউনিভার্সিটি ইন্স্টিটিউট্ হলে পার্টির সভায় লীগের ডাকা 'প্রত্যক্ষ-সংগ্রাম' সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। ১৬ই আগস্ট লীগের মিছিলে যোগদানের পক্ষেও মতামত ব্যক্ত করলেন অনেকে।

১৬ই আগস্ট মনুমেন্টের নিচে লীগের যে মিটিং ডাকা হল সেখানে

আমন্ত্রিত অ-লীগ বক্তা ছিলেন সিডিউল কাস্ট নেতা যোগেন মন্ডল। এছাড়া সুরাবর্দী নিজে কম্যুনিস্ট নেতা জ্যোতি বসুকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন ঐ মিটিং-এ বক্তব্য রাখার জন্য। যোগেন মন্ডল মঞ্চে উঠলেন। কিন্তু জ্যোতি বসু নিচেই রইলেন। উপস্থিত মুসলমান জনতার মনোভাব আঁচ করেই সুচতুর জ্যোতি বসু বুঝতে পেরেছিলেন কি ঘটতে চলেছে। ঘটনার কোন দায়বদ্ধতা তিনি নিজের কাঁধে নিলেন না।

এইভাবে জ্যোতি বসু সবাইকে ফাঁকি দিলেন ঠিকই, কিন্তু একজনকে পারলেন না। ২৫শে আগস্ট রাইটার্স বিল্ডিং-এ এক শান্তি আলোচনা সভা ডাকলেন মুখ্যমন্ত্রী সুরাবর্দী। আমন্ত্রিত হলেন কম্যুনিস্ট পার্টি থেকে জ্যোতি বসু, সিডিউল কাস্টদের তরফে যোগেন মন্ডল, কংগ্রেসের প্রতিনিধি কিরণশঙ্কর রায় এবং হিন্দু মহাসভার ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। জ্যোতি বসুর প্রতিনিধি হওয়ার যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন শ্যামাপ্রসাদ। তিনি সুরাবর্দীকে জানালেন যে, হিন্দুদের প্রতিনিধি হিন্দুমহাসভা এবং তার প্রতিনিধি তিনি নিজে। সিডিউল কাস্টদের প্রতিনিধিত্ব করছেন যোগেন মন্ডল। মুসলমানদের প্রতিনিধি সুরাবর্দী স্বয়ং। কংগ্রেস যেহেতু হিন্দু মুসলমান উভয়েরই প্রতিনিধি বলে দাবি করে, সুতরাং কিরণবাবু হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই প্রতিনিধিত্ব করছেন। কিন্তু জ্যোতি বসু কার প্রতিনিধিত্ব করছেন? তাঁর পার্টি নিজেদের হিন্দুও বলে না, আবার মুসলমানও বলে না, কিন্তু মুসলিম লীগের সমস্ত দাবি তাঁরা সমর্থন করছেন এবং জ্যোতি বসু স্বয়ং মনুমেন্টের নিচে ডাকা লীগের মিটিং-এ অংশ গ্রহণ করেছেন। অতএব জ্যোতি বসুকে প্রকাশ্যে জানাতে হবে যে তিনি কার প্রতিনিধি, আর তা না করে মিটিং-এ অংশগ্রহণ করলে শ্যামাপ্রসাদ সেই মিটিং-এ যাবেন না। শ্যামাপ্রসাদের দাবি মেনে নিলেন সুরাবর্দী। জ্যোতি বসুর ওই মিটিং-এ যোগদান করা হল না।

কম্যুনিস্টরা এই অপমানের বদলা নেওয়ার প্রথম সুযোগ পেল ১৯৪৮ সালে। ৩১শে জানুয়ারী গান্ধী নিহত হলেন নাথুরাম গডসের গুলিতে। গান্ধী হত্যার রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে সাথে সাথেই ময়দানে নামলেন নেহরু। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘকে বে-আইনী ঘোষণা করে তার কর্মীদের বিনা বিচারে জেলে পুরে দেওয়া হল। এই সুযোগে কম্যুনিস্টরাও জায়গায় জায়গায়

শ্যামাপ্রসাদের গাড়ি আটকে, গাড়ির কাঁচ ভেঙ্গে, কুৎসিত ভাষায় গালাগালি করে তাদের গান্ধী প্রেম দেখালেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। বরং স্বাধীন ভারতের প্রথম সংসদে মাত্র ৩ জন দলীয় সাংসদ নিয়ে শ্যামাপ্রসাদ হয়ে উঠলেন সমগ্র বিরোধী শিবিরের মুখপাত্র। "Even the party in power looked upon him as the unofficial leader of the opposition. এই অপমানও মুখ বুজে সহ্য করতে হল কম্যুনিস্টদের। তাই সুযোগ যখন তাঁরা পেলেন তখন তার উসুল করলেন চূড়ান্ত বর্বরতার সঙ্গেই। তখন অবশ্য শ্যামাপ্রসাদ নেই। কম্যুনিস্ট পার্টির মুখপত্রতে শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর সংবাদ পরিবেশন করা হল দু-লাইনের মধ্যে। তার কয়েকদিন পরই বের করা হল 'সাম্প্রদায়িক' 'প্রতিক্রিয়াশীল' 'বঙ্গভঙ্গকারী' শ্যামাপ্রসাদের নব মূল্যায়ন।

কংগ্রেসও অবশ্য তার গান্ধী সংস্কৃতির সঙ্কীর্ণ গন্ডী থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর খবর যেভাবে তাঁর বাড়িতে দেওয়া হয়েছিল তা শুধুমাত্র বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী সরকারের পক্ষে সম্ভব। কিন্তু স্বাধীন দেশীয় সরকার তার দেশেরই এক যোগ্য সন্তানের মৃত্যুর খবর কিভাবে তাঁর পরিবারকে জানিয়েছে তা দেখা যাক। উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখছেন—

'সেই সময়ে আমি কলকাতায়। তাই সংবাদ-প্রাপ্তির বিবরণ আমার জবানিতে লিখি।

২৩শে জুন ১৯৫৩। ৭৭ নং আশুতোষ মুখার্জি রোডে আমাদের পৈতৃক বাড়ি।

সকালবেলা। প্রায় পৌনে ছ'টা। দোতলার ভেতরের দালানে টেলিফোন বেজে ওঠে। অপারেটর জানান, শ্রীনগর থেকে জস্টিস্ মুখার্জির (বড়দাদা, রমাপ্রসাদ মুখার্জির) নামে ব্যক্তিগত ট্রাঙ্ককল।

কাশ্মীর শ্রীনগর থেকে ট্রাঙ্ক কল। মেজদা করছেন নিশ্চয়। বড়দা তখনি এসে ফোন ধরেন। বাড়ির যে যেখানে ছিলেন তাড়াতাড়ি এসে টেলিফোনের কাছে জড় হন্। মা একতলায় পূজার ঘরে। তাঁকেও নিয়ে আসা হয় ওপরে। টেলিফোনের কাছে এসে তিনি উৎসুক হয়ে দাঁড়ান। মুখভরা ম্লান হাসি। ছেলে কতো দূরে সেই কাশ্মীরে, তাকে বন্দী করে রেখেছে। খুশিভরা মুখে মন্তব্য

করেন, নিশ্চয় এইবার ছেড়ে দিয়েছে। ছাড়া পেতেই টেলিফোন করছে, — ও তো যেখানেই যখন যায়, টেলিফোনে আমার সঙ্গে কথা বলে। টেলিফোনটা দাও, বাবা, আমার হাতে, কথা বলি —এখনি হয়ত কেটে দেবে।

ওদিকে রিসিভার কানে বড়দা কথা বলছেন। কিন্তু, তাঁর মুখে হাসি নেই কেন? গম্ভীর! উদ্বিগ্ন। ইংরেজীতে বলে চলেছেন, হাঁ হাঁ — আমিই কথা বলছি, জস্টিস মুখার্জি। — কে? কে? কী কী! কী বললেন?— কী। —What! What! ...বড়দার মুখে এইভাবে কাটা কাটা কথা। প্রচন্ড উত্তেজনা।

সবাই উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে আছি বড়দার দিকে। আর মা কেবলই তাগাদা দিচ্ছেন, দাও বাবা, আমি একটু ভোতনের সঙ্গে কথা বলি। ওকে ছেড়ে দিয়েছে ত?

আমাদেরও উৎকণ্ঠার অন্ত নেই। হতবাক্ হয়ে শুনছি, এ-তরফে বড়দার উত্তেজিত বিক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বর, ওদিকের কথাগুলি কী, তখনও জানি না।

টেলিফোনে কথাবার্তা হঠাৎ শেষ। সদাশান্ত বড়দার সে কী চেহারা! স্তম্ভিত, অথচ উত্তেজিত। কিন্তু, কী কারণে? সবাই উদ্গ্রীব। মার মুখের সেই ম্লান হাসিটুকুও মুছে গেছে, বলেন, কী হোল বাবা, টেলিফোন ছেড়ে দিলে? আমাকে ওর সঙ্গে একটু কথা বলতে দিলে না?

বড়দা মাকে জানান, ওর শরীর ভাল নেই, —তুমি এখন নীচে চল মা, পূজা করোগে।

আমাকে ডাকেন, একপাশে নিয়ে যান্। কাঁপা গলায় বলেন, সব শেষ হয়ে গেছে যে! শুধু এই জানাল!

এইবার বর্ণনা দিই কীভাবে সেই খবর তাঁকে জানানো হয়।

বড়দা টেলিফোন ধরলে দিল্লীর অপারেটর কাশ্মীরের সঙ্গে লাইন যোগাযোগ করে দেন। কিন্তু কাশ্মীরের কথা বড়দা শুনতে পান্ না। তখন দিল্লীর অপারেটর মধ্যবর্তী হয়ে দু তরফের কথাবার্তা আদানপ্রদানে সাহায্য করেন। দিল্লীর অপারেটর শ্রীনগরকে যে কথাগুলি বলছিলেন বড়দা সরাসরি তা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলেন, কিন্তু শ্রীনগরের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছিলেন না। তাই দিল্লীর অপারেটর শ্রীনগর থেকে যা যেমন শুনছিলেন, বড়দাকে সেই

কথাগুলি তেমনি পুনরুল্লেখ করে জানাতে থাকেন ঃ ‘‘শ্রীনগর আমাকে বলছে যে, শেখ আবদুল্লার কাছ থেকে একটা খবর আপনাকে জানানোর আছে, সংবাদটা এই, ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি মারা গেছেন এবং শেখ আবদুল্লা জানতে চান দেহ সৎকারের কি হবে?’ ('Srinagar tells me that there is a message from Sheikh Abdullah to you and the message it that Dr. Syama Prasad Mookherjee is dead and Sheikh Addullah wants to know what about the disposal of the body?'

বড়দা অকস্মাৎ এই খবরে স্তম্ভিত হয়ে যান। উত্তেজিত হয়ে অপারেটরকে বলেন, তিনি ব্যাপার কিছুই বুঝলেন না, প্রকৃতই কি ঘটেছে সব কিছু জানতে চান, আর এ-খবর দিচ্ছেনই বা কে? দিল্লীর অপারেটর তখন শ্রীনগরকে জানান, ‘জাস্টিস্ মুখার্জি বিস্তারিত খবর জানতে চাইছেন, এবং ওদিকের উত্তর শুনে বড়দাকে জানান, ‘শ্রীনগর বলছে তিন দিন আগে ডাঃ মুখার্জির প্লুরিসি হয় ও গতকাল তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে তাঁর হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক হয়ে ৩-৪০শে তিনি মারা যান।’ খবরটা অবিশ্বাস্য মনে করে বড়দা জোর করে জানতে চান খবরটা দিচ্ছে কে? তাঁর নাম কি? তাতে আবার শ্রীনগরের সঙ্গে কথা বলে দিল্লী অপারেটর জানান, কাশ্মীরের ডেপুটি হোম মিনিস্টার মিঃ ধর টেলিফোন করছেন। বড়দাও তখনি আবার জানান, কলকাতায় অবশ্যই পাঠাতে হবে। কিন্তু পুরো ব্যাপার এখনি জানতে চাই। অপারেটর আবার শ্রীনগরের সঙ্গে কথা বলে বড়দাকে জানান কাশ্মীর সরকার কর্তৃপক্ষ আধঘন্টা পরে আবার টেলিফোন করবেন বলছেন।

এই ভাবেই শ্যামাপ্রসাদের জননী ও পরিবারবর্গকে সেই মর্মান্তিক দুঃসংবাদ জানানো!’

এছাড়াও দিল্লীর নেহরু সরকারের পক্ষ থেকে শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু নিয়ে কি কদর্য রাজনীতি করা হয়েছিল তা উমাপ্রসাদের অভিজ্ঞতা থেকেই তুলে দেওয়া হল —

‘সেই ২৩শে জুনের পরবর্তী ঘটনাবলিও সংক্ষেপে লিখি। বেলা প্রায় ১১টায় কাশ্মীর সরকারের হোম মিনিস্টার বক্সী গোলাম মোহাম্মদ টেলিফোন করে জানান, শ্রীনগর থেকে বেলা সাড়ে দশটায় ডাঃ মুখার্জির

শবদেহ নিয়ে প্লেন রওনা হয়েছে এবং বেলা তিনটে নাগাদ কলকাতায় পৌঁছুবে আশা করেন। কিন্তু সেই প্লেন দমদমে পৌঁছায় রাত ন'টায়! শ্রীত্রিবেদী (কৌঁসুলী) সেই শবদেহের সঙ্গে আসছিলেন। তিনি তাঁর বিবৃতিতে এই অত্যধিক বিলম্বের কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেছেন। অনুসন্ধান করলে জানতে পারা যাবে, এই ঘটনার পিছনে ভারত সরকারের কোন হাত ছিল কিনা এবং শ্যামাপ্রসাদের মরদেহ যাতে রাত্রির আগে কলকাতায় না পৌঁছায় সেই উদ্দেশ্যে, ইচ্ছা করেই অতখানি বিলম্ব ঘটান হয়েছিল কিনা!'

শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু সংবাদ সমগ্র দেশে আলোড়ন তুলেছিল তা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। সত্যিই শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু হয়েছিল না তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল এই সন্দেহ আজও দূর হয়নি। যাঁরা তা দূর করতে পারতেন তাঁরা তা করেননি। বরং তাঁদের আচার আচরণ ছিল অপরাধমূলক। বন্দী থাকা অবস্থায় শ্যামাপ্রসাদ ডায়েরী লিখতেন। তাছাড়াও অন্যান্য কিছু লেখা লিখে সময় কাটাতেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ব্যবহৃত জিনিষপত্রের সঙ্গে সেই ডায়েরী বা লেখাগুলি পাওয়া যায়নি। কাশ্মীর সরকার এবং দিল্লী সরকারকে অনেক অনুরোধ করেও ওইগুলি শ্যামাপ্রসাদের পরিবারের লোকজন ফেরত পাননি।

শ্যামাপ্রসাদের চিকিৎসা ব্যবস্থা, অসুখ, থাকার জায়গা—প্রভৃতি নিয়েও সরকারের তরফ থেকে পরস্পর বিরোধী বিবৃতি দেওয়া হয়েছিল।

সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, এইরকম গুরুত্বপূর্ণ একজন নেতার এই রহস্যজনক মৃত্যু নিয়ে সরকারের তরফ থেকে কোন বিচার বিভাগীয় তদন্তের ব্যবস্থা করা হয়নি। নেহরু কোনভাবেই বিচার বিভাগীয় তদন্ত করতে রাজী ছিলেন না। এমনকি শ্যামাপ্রসাদের বৃদ্ধা মা যোগমায়া দেবীর পুত্রের মৃত্যু নিয়ে বিচার বিভাগীয় তদন্তের আকুল আবেদনও নেহরু অগ্রাহ্য করেন। এই প্রসঙ্গে যোগমায়া দেবী ও জহরলাল নেহরুর মধ্যে যে পত্র বিনিময় হয়েছিল তা নিচে দেওয়া হল।

পত্র নং ৪৯৯ —পি. এম.—নয়া দিল্লী, জুন ৩০, ১৯৫৩

প্রিয় শ্রীমতী মুখার্জী,

কিছুদিন আগে যখন আমি জেনেভা থেকে কায়রো রওনা হচ্ছি, সে সময়ে আপনার পুত্র ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পরলোকগমনের সংবাদ শুনে মর্মাহিত হই। সংবাদটি আমায় আঘাত হেনেছিল, কারণ রাজনীতিতে আমাদের মধ্যে মতবিরোধ থাকলেও আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করতাম, ভালও বাসতাম। আপনি তাঁর মা, আপনার কাছে এ আঘাত অত্যন্ত বেশী এবং আপনার দুঃখ লাঘব করার মত কোন ভাষা আমার নেই।

আমি কায়রো থেকে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে একটি তারবার্তা পাঠিয়ে আপনাকে আমার গভীরতম সমবেদনা ও সান্ত্বনা জানাতে বলি। শ্যামাবাবুর মৃত্যু আমার কাছে আরও দুঃখের বিশেষ করে এই কারণে যে এটা ঘটল তাঁর বন্দীদশায়। প্রায় পাঁচ সপ্তাহ আগে যখন আমি কাশ্মীর যাই, তখন আমি বিশেষ করে তাঁকে কোথায় রাখা হয়েছে এবং তাঁর শরীর কেমন আছে সে বিষয়ে খোঁজখবর নিয়েছিলাম। আমাকে জানানো হয়, তাঁকে কোন কারাগারে না রেখে শ্রীনগরে বিখ্যাত ডাল লেকের ধারে একটি প্রাইভেট বাংলোতে রাখা হয়েছে। আমি দেখলাম কাশ্মীর সরকার তাঁকে যথাসম্ভব আরাম ও সুবিধা দেবার জন্য তৎপর এবং তাঁর স্বাস্থ্য ভাল আছে। আমি তখন এ খবর শুনে সন্তুষ্ট হই। আসলে আমি আশা করেছিলাম, কাশ্মীরের স্বাস্থ্যকর জল-হাওয়ায় শ্যামাবাবুর স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে পারে।

কিন্তু তা হবার নয় এবং সেইজন্যই আঘাত ও দুঃখ আরও বেশী করে লাগে।

আমার মনে হয়, মানুষের সাধ্য ও ক্ষমতায় আর কিছু করার ছিল না এবং আয়ত্তাতীত পরিস্থিতির কাছে আমাদের হার মানতে হয়।

শ্রদ্ধেয়া ভদ্রমহোদয়া, আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার ও আমার দুঃখ নিবেদন করছি। আপনার কোন সেবায় আমার প্রয়োজন হলে আপনি নির্দ্বিধায় আমাকে জানাবেন।

ভবদীয়

স্বাঃ জওহরলাল নেহরু।

৭৭ আশুতোষ মুখার্জী রোড কলিকাতা
৪ঠা জুলাই, ১৯৫৩

প্রিয় শ্রীনেহরু,

আপনার ৩০শে জুন তারিখের চিঠি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় আমার কাছে ২রা জুলাই তারিখে পাঠিয়েছেন।

আপনার সান্ত্বনা ও সমবেদনার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই।

আমার প্রিয় সন্তানের তিরোধানে সমস্ত জাতি শোকমগ্ন। সে শহীদের মৃত্যু বরণ করেছে। আমি আমি তার মা, আমার কাছে এই দুঃখ এত গভীর ও পবিত্র যে তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আমি আপনার কাছ থেকে কোন সান্ত্বনা পাবার জন্য এ চিঠি লিখছি না। আপনার কাছে আমার যেটা দাবি সেটা হচ্ছে ন্যায়বিচার। আমার পুত্র বন্দীদশায় মারা গেছে —যে বন্দীদশার আগে কোন বিচার হয় নি। আপনার চিঠিতে আপনি বোঝাতে চেষ্টা করছেন যে, কাশ্মীর সরকারের যা যা করা উচিত ছিল সবই করেছিল। কাশ্মীর সরকার আপনাকে যে সংবাদ দিয়েছে তারই ভিত্তিতে আপনি ও-কথা বলেছেন।

আমি প্রশ্ন করি, যেসব লোকদের নিজেদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়ানোর কথা, তাদের কাছ থেকে পাওয়া সেই সংবাদের মূল্য কি? আপনি বলেছেন, আমার পুত্রের বন্দিত্বকালে আপনি কাশ্মীর গিয়েছিলেন। তার প্রতি আপনার ভালবাসা ছিল তাও বলেছেন। আমি জানি না, আপনার তার সঙ্গে দেখা করে তার স্বাস্থ্য ও তার জন্য কিরূপ ব্যবস্থা করা হয়েছে সে সম্বন্ধে খোঁজখবর নিয়ে নিশ্চিন্ত হতে কি বাধা ছিল?

তার মৃত্যু রহস্যাবৃত। এটা কি অত্যন্ত বিস্ময়কর ও আঘাতজনক নয় যে তার বন্দী হওয়ার পরে তার প্রথম সংবাদ কাশ্মীর সরকারের কাছ থেকে আমি তার মা যা পেলাম তা হোল যে আমার ছেলে আর নেই, এবং সে সংবাদও পেলাম সব শেষ হয়ে যাবার দুই ঘন্টা পরে? আর কি নিষ্ঠুর সংক্ষিপ্ত ভাবেই না সংবাদটি পাঠানো হয়েছিল! হাসপাতালে ভর্তি করার পর আমার পুত্র যে টেলিগ্রাম করেছিল সেটাও আমাদের কাছে এসে পৌঁছল তার নিদারুণ মৃত্যুসংবাদের পর। বন্দী হওয়ার পর থেকেই যে আমার পুত্রের শরীর খারাপ

যাচ্ছিল এ ব্যাপারে নিশ্চিত ও সঠিক সংবাদ আছে। সে পর পর কয়েকবারই এবং বেশ কিছুদিনের জন্যে নিশ্চিতভাবেই অসুস্থ হয়ে পড়ে। আমি জিজ্ঞাসা করি, কাশ্মীর সরকার অথবা আপনার সরকার কোন সংবাদই আমাকে বা আমাদের আত্মীয়বর্গের কাউকে পাঠায়নি কেন?

যখন তাকে হাসপাতালে পাঠানো হল, তখনও তারা খবরটি আমাদের বা ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে অবিলম্বে জানানো প্রয়োজন বোধ করেনি। এটাও দেখা যাচ্ছে যে, কাশ্মীর সরকার শ্যামাপ্রসাদের স্বাস্থ্যের পূর্ব ইতিহাস জানার এবং তার সেবা ও প্রয়োজনের সময়ে আপৎকালীন চিকিৎসার ব্যবস্থা নিতে কোন গা করেনি। তার পুনঃ পুনঃ অসুস্থতার ধাক্কাকেও গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। এর ফল হল মারাত্মক। আমি স্পষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ দিয়ে প্রতিপন্ন করতে পারি, আমার পুত্রের নিজের কথাতেই, ২২ তারিখ ভোরবেলায় সে অবসন্ন বোধ করেছিল। আর সরকার কি করেছিলেন? চিকিৎসার ব্যবস্থা হতে অযথা বিলম্ব, অত্যন্ত অবিবেচকের মত ব্যবস্থা করে তাকে হাসপাতালে পাঠানো, হাসপাতালে তার কাছে তাই দুই সহবন্দীকেও থাকতে না দেওয়া সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হৃদয়হীন আচরণের কয়েকটি জ্বলন্ত নিদর্শন।

শ্যামাপ্রসাদের চিঠিগুলি থেকে এলোমেলো ভাবে কতকগুলি বেছে নিয়ে, তার থেকে আবার বিক্ষিপ্ত ভাবে কিছু মন্তব্য উদ্ধার করে "তার স্বাস্থ্য ভাল ছিল" বলে কাশ্মীর সরকার এবং তাদের ডাক্তারদের দায়দায়িত্ব কিছুতেই কোন ভাবেই এড়ানো বা লাঘব করা যাবে না। উদ্ধৃতিগুলির সার্থকতা কি? কেউ কি সত্যি বিশ্বাস করবে যে তার মত লোক আত্মীয়স্বজনবর্গ থেকে দূরে বন্দীদশায় থেকে কখনও তার অসুবিধার কথা বা শারীরিক অসুস্থতার কথা চিঠিতে লিখে জানাবে? সরকারের দায় ছিল অসীম এবং গুরুতর।

তাদের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ যে তারা অবশ্যপালনীয় কর্তব্য করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং চূড়ান্ত অবহেলা দেখিয়েছে। আপনি বন্দীদশায় আমার আদরের শ্যামাপ্রসাদকে স্বাচ্ছন্দ্য ও সুযোগসুবিধা দেওয়া হয়েছে বলেছেন। এটা খতিয়ে দেখার বিষয়। কাশ্মীর সরকার তার পরিবারবর্গের সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান করতে দেওয়ার ভদ্রতাটুকু দেখায় নি। চিঠিগুলি অনেক দিন পর্যন্ত আটকে রাখা হত এবং কতকগুলি রহস্যজনক

ভাবে উধাও হয়ে গেছিল। বাড়ির খবরের জন্য, বিশেষ করে তার রুগ্ন কন্যার জন্য এবং এই অধমের জন্য দুশ্চিন্তা তাকে পীড়া দিত। আপনি শুনে অবাক হবেন কিনা জানি না, আমরা ১৫ই জুন তারিখের লেখা চিঠিগুলি পেলাম ২৭শে জুন, সেগুলি কাশ্মীর সরকার ২৪শে অর্থাৎ তার মরদেহ পাঠাবার একদিন পরে ডাকে দিয়েছিলেন। সেই প্যাকেটে আমার এবং এখানকার অন্যান্যদের শ্যামাপ্রসাদকে লেখা চিঠিও আমাদের কাছে ফেরত এসেছে। এগুলি ১১ই এবং ১৬ই জুন শ্রীনগরে পৌঁছলেও তাকে দেওয়াই হয় নি। এটি মানসিক নির্যাতন করার নিদর্শন। সে বারংবার হেঁটে বেড়ানোর জন্য পর্যাপ্ত জায়গা চেয়েছিল। এর অভাবে সে অসুস্থ বোধ করছিল। কিন্তু তাকে বার-বারই প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। এটা কি শারীরিক নির্যাতনের একটা উপায় নয়? আপনি যখন আমাকে বলেন, "তাকে কোন কারাগারে নয়, শ্রীনগরে বিখ্যাত ডাল লেকের ধারে একটি আলাদা বাংলোতে রাখা হয়েছে", তখন আমার মন বিস্ময়ে এবং অপমানে ভরে ওঠে। একটি সামান্য প্রাঙ্গণওলা ক্ষুদ্র বাংলোর দিবারাত্র একদল সশস্ত্র রক্ষীদের পাহারায় বন্দী থাকা—এই হল তার সেখানকার জীবন। সোনার খাঁচা হলে বন্দী সুখী হয়, এ কথা কি যথার্থ বলে মানা যায়? এ ধরনের নির্লজ্জ প্রচার আমার শুনলেও গা ঘিনঘিন করে। আমি জানি না তার কি চিকিৎসা বা সেবাযত্ন হয়েছিল। আমি শুনেছি সরকারী খবরগুলি সব পরস্পর-বিরোধী। বিখ্যাত চিকিৎসকেরা তাঁদের মন্তব্যে বলেছেন, এটা আর কিছু না হোক চূড়ান্ত অবহেলার নিদর্শন। ব্যাপারটির পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।

আমি এখানে আমার প্রিয় পুত্রের মৃত্যুর জন্য বিলাপ করছি না। স্বাধীন ভারতের এক নির্ভীক সন্তান বন্দী অবস্থায় বিনাবিচারে চরম শোচনীয় এবং রহস্যজনক পরিস্থিতিতে মৃত্যুবরণ করেছে। সেই মহান প্রয়াত বীরের মা হিসেবে আমি অবিলম্বে নিরপেক্ষ ও যোগ্য ব্যক্তিদের দ্বারা সম্পূর্ণ অপক্ষপাত এবং প্রকাশ্য তদন্তের দাবি করছি। যে জীবন চলে গেছে তা আর কিছুতেই আমাদের ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না তা আমি জানি। কিন্তু যা আমি অবশ্যই চাই তা হল স্বাধীন ভারতে এই যে বিরাট শোচনীয় ঘটনা ঘটে গেল তার প্রকৃত কারণগুলি এবং আপনার সরকারের তাতে কি ভূমিকা ছিল, ভারতের জনগণ

নিজেরা তার বিচার করুক।

কোথাও যদি কোন ব্যক্তি অন্যায় করে থাকে, —যত উঁচুপদেই সে ব্যক্তি অধিষ্ঠিত হোক্ না কেন, —তার সঠিক বিচার হোক এবং জনগণ সতর্ক হোক যেন স্বাধীন ভারতে আর কোন জননীকে আমার মত দুঃসহ মানসিক যন্ত্রণায় ও দুঃখে অশ্রুপাত করতে না হয়।

আপনি দয়া করে বলেছেন, আপনার কাছে কোন সেবা বা সাহায্যের দরকার হলে যেন নির্দ্ধধায় আপনাকে জানাই। আমার এবং ভারতের জননীদের পক্ষ থেকে এটাই আমার দাবি, সত্যকে উদ্ভাসিত করার কাজে ঈশ্বর আপনার সহায় হোন।

চিঠি শেষ করার আগে একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ের উল্লেখ করব। কাশ্মীর সরকার শ্যামাপ্রসাদের যেসব জিনিস ফিরত পাঠিয়েছিনে তার ভিতর তার ব্যক্তিগত ডায়েরী এবং হাতে লেখার কাগজপত্র আসেনি। বক্সী গোলাম মহম্মদ এবং আমার জ্যৈষ্ঠপুত্র রমাপ্রসাদের মধ্যে যে পত্রালাপ হয়েছে তার প্রতিলিপি এই সঙ্গে দিলাম। আপনি যদি কাশ্মীর সরকারের কাছ থেকে পাণ্ডুলিপিগুলি এবং ডায়েরীটি উদ্ধার করে দেন, তাহলে বিশেষ অনুগৃহত থাকব। এগুলি নিশ্চয় তাদের কাছে আছে।

আশীর্বাদান্তে
আপনার শোকমগ্ন
যোগমায়া দেবী।

নয়া দিল্লী

৫ই জুলাই, ১৯৫৩

প্রিয় শ্রীমতী মুখার্জী,

আপনার ৪ঠা জুলাইয়ের চিঠির জন্য ধন্যবাদ। চিঠিটি এইমাত্র আমার কাছে এসেছে।

প্রিয় পুত্রের মৃত্যুতে জননীর দুঃখ ও মানসিক যন্ত্রণা কি হয়, তা আমি ভালই বুঝতে পারি। যে আঘাত আপনি পেয়েছেন, আমার কোন কথাতেই তার উপশম হবে না।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদের বন্দীদশা এবং তাঁর মৃত্যুর ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে অনুসন্ধান না করে আমি আপনাকে লিখতে সাহস করি নি। তার পরেও যাঁদের কিছু প্রকৃত ঘটনা জানার সুযোগ হয়েছিল তাঁদের কয়েকজনকেও জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। আমি এইটুকু বলতে পারি যে রহস্যের কিছু ছিল না এবং ডঃ মুখার্জীকে যে সব রকম সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছিল যে বিষয়ে আমার পরিষ্কার ও যথার্থ (clear and honest) ধারণা জন্মেছে।

কাশ্মীরে চিঠিপত্র বিমানে যায়, কিন্তু আবহাওয়ার গোলমালে বিমান চলাচল খুবই অনিয়মিত এবং কখনও কখনও এক সপ্তাহ বা তারও বেশী বন্ধ থাকে। সত্য বলতে কি বর্তমানেই এক সপ্তাহের ওপর বিমান চলাচল বন্ধ আছে, যে কারণে আমি যে সব জরুরী চিঠি পাঠিয়েছি সেগুলি পৌঁছতে দেরি হচ্ছে।

জেলে আমার দশবছর জীবন কেটেছে এবং ভারতের নানা ধরনের অসংখ্য কারাগারে আমাকে থাকতে হয়েছে এবং সেই জন্যেই বন্দীর মনের অবস্থা কি হয় এবং বন্দীদশার অবস্থা সাধারণত কি রকম হয় সে সম্বন্ধে আমার কিছু জানা আছে।

ডঃ মুখার্জী হঠাৎ যেদিন মারা গেলেন, কাশ্মীর সরকারের এক মন্ত্রী জাস্টিস মুখার্জীকে টেলিফোন করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি দীর্ঘ সময় ধরে চেষ্টা করেও লাইন পাননি এবং তার পরেও সরাসরি কথা বলতে পারেন নি। দুজন টেলিফোন অপারেটর মারফৎ তাঁর কথা 'রিলে' করে পাঠান হয় এবং

নিঃসন্দেহে সেগুলি সম্পূর্ণ বিকৃত হয়ে পৌঁছেছিল।

ডঃ মুখার্জীর ডায়েরী এবং অন্যান্য কাগজপত্রের জন্য আপনি যে অনুরোধ করেছেন সেটি বক্সী গোলাম মহম্মদের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমি নিশ্চিত তাঁর কাছে কোন কাগজপত্র যদি থেকে থাকে তাহলে তিন নিশ্চয়ই সেগুলি পাঠিয়ে দেবেন।

ভবদীয়
জওহরলাল নেহরু

৭৭ আসুতোষ মুখার্জী রোড, কলিকাতা

৯ই জুলাই, ১৯৫৩

মিঃ নেহরু,

আপনার ৫ই জুলাইয়ের চিঠি আমার কাছে ৭ তারিখে পৌঁছেছে।

আপনার চিঠিটি গোটা পরিস্থিতির ব্যাপারে এক দুঃখজনক ভাষ্য। ...পনার মনোভাব রহস্য অনাবৃত করার ব্যাপারে সাহায্য না করে বরং ...স্যকে আরও ঘনীভূত করে তুলেছে। আমি প্রকাশ্য তদন্ত চেয়েছিলাম, ...পনার পরিষ্কার ও যথার্থ ধারণা জানতে চাই নি।

সমস্ত ব্যাপারটির বিষয়ে আপনার মনোভাব এখন সর্বজনবিদিত। ...তের জনগণকে এবং আমাকে, শ্যামাপ্রসাদের মাকে, এর যথার্থ্যে বিশ্বাস ...তে হবে। বহু লোকের মনে সন্দেহ দানা বেঁধেছে। যা দরকার তা হোল ...লম্বে প্রকাশ্য ও অপক্ষপাত তদন্ত।

আমার চিঠিতে উল্লিখিত নানা বিষয়ের উত্তর পাই নি। আমি আপনাকে ...ষ্কার জানিয়েছিলাম যে কতকগুলি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং প্রয়োজনীয় তথ্য ...পন্ন করার মত নিশ্চিত সাক্ষ্য প্রমাণ আমার কাছে আছে। আপনি সেগুলি ...তে বা দেখতে আগ্রহী নন। আপনি জানিয়েছেন যে, "যাদের প্রকৃত ঘটনা ... জানার সুযোগ হয়েছিল তাদের কয়েকজনকে" জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন। ... আশ্চর্য লাগে যে আমরা —তার পরিবারবর্গ যে বিষয়টির ওপর কিছু ...লাক পাত করতে পারি তা গণ্য করা হল না। এবং এতৎসত্ত্বেও আপনি ...পনার ধারণাকে 'যথার্থ' বলেছেন।

কাশ্মীর বিমান ডাকের অনিয়মিত চলাচলের যে কথা আপনি উল্লেখ ...ছেন তা এখানে খাটে না। তাতে বহুক্ষেত্রে অপরিমিত বিলম্ব এবং ...পত্রের সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার ব্যাখ্যা হয় না। আপনি যদি আমার ...টি মন দিয়ে যত্ন সহকারে পড়ার কষ্টটুকু স্বীকার করতেন, আমি নিশ্চিত যে ...লে আপনি এই রকম বাজে অজুহাত দিতে ইতস্তত করতেন। আমাদের ...হ যে চিঠিগুলি আছে তার খামের ওপর ডাকঘরের ছাপের তারিখগুলিই ...চতভাবে বর্তমান ... আপনার ধারণাকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করছে।

জেলে আপনার অভিজ্ঞতার কথা সকলেই জানে। এটা এক সময়ে আমাদের বিরাট জাতীয় গর্ব ছিল। কিন্তু আপনি কারাগারের যন্ত্রণা ভোগ করেছেন বিদেশী শাসনাধীনে আর আমার ছেলে বিনা বিচারে বন্দীদশায় মৃত্যুবরণ করল এক জাতীয় সরকারের আমলে। যদি ব্রিটিশ শাসনাধীনে কারান্তরালে এইরকম শোচনীয় এবং রহস্যময় সমাপ্তি ঘটত তাহলে কি হত?

আপনাকে আর বেশি কিছু লেখা বৃথা। আপনি প্রকৃত ঘটনার সম্মুখীন হতে ভয় পাচ্ছেন। আমার পুত্রের মৃত্যুর জন্য আমি কাশ্মীর সরকারকে দায়ী করছি। আপনার সরকারকে এই অপকর্মের অংশীদার হিসেবে অভিযুক্ত করছি। আপনি আপনার হাতে যা বিপুল ক্ষমতা তার সব কিছু দিয়ে বেপরোয়া প্রচার চালাতে পারেন, কিন্তু সত্য নিজে তার প্রকাশের পথ খুঁজে নেবেই, এবং একদিন আপনাকে ভারতবাসীর কাছে এবং স্বর্গে ঈশ্বরের কাছে এর জন্যে জবাবদিহি করতে হবে।

আমি আমাদের পত্রালাপ সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য পেশ করছি। প্রধানমন্ত্রী যখন অকৃতকার্য হন, তখন ভারতবাসীই বিচার করুক ও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিক।

আপনার শোকমগ্না
যোগমায়া দেবী

*　　*　　*

নশ্বর দেহী শ্যামাপ্রসাদ চলে গেলেন, কিন্তু অবিনশ্বর রয়ে গেল তাঁর ত্যাগ, আত্মবলিদান, দেশপ্রেম আর সৌর্যের ছটা। আনন্দবাজারের সম্পাদকীয়র ছন্দে ফুটে উঠেছে সেই ভাব —

"সহসা ভূমিকম্পে মানুষের অভ্যস্ত জীবন-যাত্রা যেমন বিভ্রান্ত হইয়া যায়, ডঃ শ্যামাপ্রসাদের আকস্মিক অকালমৃত্যু সমগ্র দেশ ও সমাজকে তেমনি বিচলিত করিয়াছে। বিনা মেঘে ব্রজ্রপাতের মত এই দুঃসংবাদ ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সকলকে স্তব্ধ ও বিক্ষুব্ধ করিয়াছে। কেবল ভারতে নহে, ভারতের বাহিরেও ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে। কাশ্মীরের বন্দনদশায়

যেভাবে তাঁহার দেহান্ত ঘটিল তাহা ভারতের ইতিহাসে এক চিরকালের প্রশ্ন হইয়া থাকিবে। কাশ্মীর সরকার তাঁহাকে আটক করিয়াছিলেন। কিন্তু যিনি কখনও কাহার নিকট নতি স্বীকার করেন নাই বন্দীদশার বন্ধন তিনি আপনিই ছিন্ন করিয়াছেন। আজ তিনি নাই; আজ আর 'হিবিয়াস কপাস' আবেদনের প্রয়োজন নাই, উচ্চতম ন্যায়ালয়ের নির্দেশও প্রয়োজন নাই।

শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু সংবাদ প্রথম যখন লোকে শুনিয়াছে তখন কেহ বিশ্বাস করে নাই। এমন নিদারুণ! এমন আকস্মিক! এমন অসহনীয়! এতবড় দুর্ধর্ষ প্রাণশক্তির যে এমনি করিয়া অবসান হইয়া যাইবে ইহা কেহ কল্পনা করে নাই, কল্পনা করা যায় না। এই দুঃসহ ঘটনাকে লোকে যখন বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছে, তখনই লোকের মর্ম মথিত করিয়া একটি প্রশ্ন বড় হইয়া উঠিয়াছে — ডঃ শ্যামাপ্রসাদ যে অসুস্থ তাহার কোন সংবাদ এতদিন প্রকাশ করা হয় নাই কেন? প্রাতঃকালীন পত্রিকায় কেবলমাত্র তাঁহার প্লুরিসি রোগে আক্রান্ত হওয়ার সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। সে সংবাদ লোকের চোখে পড়িবার পূর্বেই একেবারে চরম সংবাদ আসিয়া পড়িল। আজ দেশব্যাপী এই প্রশ্ন প্রবল হইয়া উঠিয়াছে —ডঃ শ্যামাপ্রসাদের পীড়ার উপযুক্ত চিকিৎসা হইয়াছে কি না? চিকিৎসায় বিভ্রাট ঘটিয়াছে কি না? এখন জানা যাইতেছে, ৪ দিন পূর্বেই তিনি অসুস্থ হইয়াছিলেন। কাশ্মীর সরকার তাহা প্রকাশ করেন নাই কেন? ডঃ শ্যামাপ্রসাদকে আটক করিয়া যে মূল্যবান জীবনের ভার তাঁহারা যাহাতে যথাসম্ভব উৎকৃষ্ট চিকিৎসা হইতে পারে, তজ্জন্য তাঁহারা কলিকাতায় তাঁহার পরিবারবর্গের নিকট খবর দিলেন না কেন? ভারত সরকারই তাহাতে উদ্যোগী হইলেন না কেন? শেখ আবদুল্লা শ্যামাপ্রসাদকে আটক রাখিয়াছিলেন তাহা কেবল তাঁহার একার দায়িত্ব নহে। তাহাতে ভারত সরকারেরও দায়িত্ব আছে। প্লুরিসিতে সহসা কেহ মরে না। সুতরাং চিকিৎসা বিভ্রাটের প্রশ্ন যে শুধু এখনই উঠিয়াছে তাহা নহে, ইহা চিরন্তন প্রশ্ন হইয়াই থাকিবে। শেখ আবদুল্লার সরকার লোকচক্ষে সন্দেহভাজন হইয়া থাকিবেন এবং ভারত সরকারও সেই দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পাইবেন না।

শ্যামাপ্রসাদের মহাপ্রয়াণ সাধারণ মৃত্যু নহে, ইহা আত্মবলিদান। কাশ্মীরের হিতার্থে, ভারতের হিতার্থে শেখ আবদুল্লার হিতার্থে এবং পন্ডিত নেহরুর

হিতার্থে তিনি আত্মবলিদান করিয়াছেন, তাঁহার মৃত্যুর এই আকস্মিক আঘাত যে চেতনার সঞ্চার করিবে, সেই চেতনার আলোকে সকলে উপলব্ধি করিতে পারিবেন — কাশ্মীর ও ভারতের সম্বন্ধ কি এবং কাশ্মীরের সহিত ভারতের সেই স্বাভাবিক সম্পর্ক সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার পথ কি এবং কর্তব্য কি। ....পন্ডিত নেহরু ও শেখ আবদুল্লা মিলিয়া যাহা ঠেকাইয়া রাখিতে চাহিয়াছেন তাহা কাশ্মীরের সহিত ভারতের স্বাভাবিক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠার গণচেতনার দাবী। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ সমগ্র দেশের গণচেতনার এই দাবীকে রূপ দিয়াছিলেন এবং আত্মবিসর্জন দিয়া তাহাকে চিরকালের মতো সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়া গেলেন। আবদুল্লা সরকার বা নেহরু সরকারের আর সাধ্য নাই যে ইহাকে ঠেকাইযা রাখেন। ডঃ শ্যামাপ্রসাদের আত্মবিসর্জনে গণচেতনার যে তরঙ্গস্রোত উন্মুক্ত হইবে, আপনার অন্যগতির মুখে তাহা সকল বাধা অপসারিত করিয়া চলিবে। ...... ডঃ শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু নিয়তির সতর্কবাণী। শেখ আবদুল্লা ও পন্ডিত নেহরু যদি কল্যাণ বুদ্ধির দ্বারা চালিত হন, তাহা হইলে এই নিয়তির সম্মুখে অবনত হওয়া ছাড়া তাঁহাদের গত্যন্তর নাই।

শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুতে ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্র হইতে একটি উজ্জ্বল প্রতিভাময় বহুমুখী ব্যক্তিত্বের তিরোধান ঘটিল। জীবনের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে সমান অধিকারের সহিত বিচরণ করিবার এমন অপূর্ব বৈচিত্রময় শক্তির সমন্বয় সহসা দেখা যায় না। একটা মানুষ যে একাই সঙ্ঘবদ্ধ দলের কাজ করিতে পারে, একটা মানুষ যে একাই একটা সমগ্র প্রতিষ্ঠানের ব্যাপকতা বহন করিতে পারে তাহা আমরা দেখিয়াছি। ভারতীয় সংসদে একজন একাই সমগ্র বিরোধীপক্ষের শক্তি ধারণা করিয়াছেন, এই অভূতপূর্ব দৃশ্য দীর্ঘকালের মধ্যে আর দেখা যাইবে না। যে একক সিংহগর্জনে সমগ্র সরকারপক্ষ প্রকম্পিত হইতেন তাহা চিরকালের মত স্তব্ধ হইয়া গেল।

...... এত অল্পকাল ব্যাপী জীবন এত প্রচুর সাফল্য সাধারণত পৃথিবীর বৃহৎ ব্যক্তিগণের মধ্যেও কম দেখা যায়। শিক্ষায়, সমাজে, ধর্মে, রাজনীতিতে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, আইনসভায়, মন্ত্রিমন্ডলে, যেখানেই তিনি যোগ দিয়াছেন সেখানেই তিনি সকলের মধ্যে প্রধান এবং প্রত্যেক স্থলেই তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাব সুস্পষ্ট, তাঁহার উপস্থিতি মাত্রই সকলে অনুভব করিতে পারিয়াছে যে,

এমন একজন ব্যক্তি আসিয়াছেন যাঁহাকে স্বীকার না করিয়া এবং যাঁহার কথা না শুনিয়া উপায় নাই। তিনি আপনার ব্যক্তিত্বে ও সমপ্রাণতায় সমগ্র বাঙ্গলার ও বাঙ্গালী সমাজের প্রতীক হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। আমাদের জীবনে যখন যেখানে আঘাত আসিয়াছে, সেখানেই আমরা তাঁহাকে উপস্থিত হইতে দেখিয়াছি এবং আমাদের হইয়া বুক পাতিয়া তিনি সে আঘাত লইয়াছেন। বাঙ্গালী সমাজ তাঁহাকে কতখানি আপনার করিয়া লইয়াছিল তাঁহার মৃত্যু সংবাদে বিচলিত আবালবৃদ্ধবণিতার উদ্বেল জনতা মহানগরীর পথে পথে তাহা প্রমাণ করিতেছে। ইহা কেবল মহানগরীর ব্যাপার নহে, কেবল বাঙ্গলা দেশের ব্যাপার নহে, ভারতের অখণ্ড জাতীয়তাবাদের আদর্শ যিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেই আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন বিসর্জন দিলেন তাঁহাকে হারাইয়া সমগ্র ভারত জনসমাজেই আজ এমনই বিহ্বলতা দেখা দিয়েছে। .....শ্যামাপ্রসাদ আজ লোকান্তরে। মৃত্যুর মধ্য দিয়া কি করিয়া অমর হইতে হয় তাহা তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন। ''মহামরণের" এই গম্ভীর পরিণতির সম্মুখে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছি। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় প্রশ্ন উঠিতেছে —হায, মা! আবার আসিবে কি?"

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত কাজী নজরুল ইসলামের একটি পত্র

শ্রীচরণেষু, আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ করুন। মধুপুরে এসে অনেক relief & relaxation অনুভব করছি। মাথার যন্ত্রণা অনেকটা কমেছে। জিহ্বার জড়ত্ব সামান্য কমেছে। আপনি এত সত্বর আমার ব্যবস্থা না করলে হয়ত কবি মধুসুদনের মত হাসপাতালে আমার মৃত্যু হত। আমার স্ত্রী আজ প্রায় পাঁচ বৎসর পঙ্গু হয়ে শয্যাগত হয়ে পড়ে আছে। ওকে অনেক কষ্টে এখানে এনেছি। ওর অসুখের জন্যই এখনো সাত হাজার টাকার ঋণ আছে। এর মধ্যে মাড়োয়ারী ও কাবুলিওয়ালাদের ঋণই বেশি। হক সাহেব যখন আমার কাছে এসে কাঁদতে থাকেন যে, ''আমায় রক্ষা কর, মুসলমান ছেলেরা রাস্তায় বেরুতে দিচ্ছে না'', আমি তখন মুসলিম লীগের ছাত্র ও তরুণদলের লীডারদের ডেকে তাদের শান্ত করি। তারপর assembly-র সমস্ত মুসলমান মেম্বারদের কাছে আমি আবেদন করি। তাঁরা আমার আবেদন শুনলেন। ৭৪ জন মেম্বার হক সাহেবকে সমর্থন করতে রাজি হলেন। ''নবযুগের'' সম্পাদনার ভার যখন নিই, তার কিছুদিন আগে ফিলমের music-direction- এর জন্যে সাত হাজার টাকার কন্‌ট্রাক্ট্ পাই। হক সাহেব ও তাঁর অনেক হিন্দু-মুসলমান supporter আমায় বলেন যে, তাঁর ও ঋণ শোধ করে দেবেন। আমি film-এর contract cancel করে দিই। পরে যখন দু'তিন মাস তাগাদা করে টাকা পেলাম না, তখন হক সাহেবকে বললাম, ''আপনি কোন ব্যাঙ্ক থেকে অল্প সুদে আমায় ঋণ করে দেন, আমার মাইনের অর্দ্ধেক প্রতিমাসে কেটে রাখবেন।'' হক সাহেব খুশী হয়ে বললেন, ''পনের দিনের মধ্যে ব্যবস্থা করব্।'' তারপর সাতমাস কেটে গেল, আজ নয় কাল করে। তাঁর supporter - রাও উদাসীন হয়ে রইলেন। আপনি জানে Secretariate - এ আপনার সামনে হক সাহেব বললেন, ''কাজীর ঋণ শোধ করে দিতে হবে। আপনিও আমাকে বললেন ''ও হয়ে যাবে''। আমি নিশ্চিন্ত মনে কাজ করলাম। আপনি জানেন, হিন্দু-মুসলমান unity-র জন্য আমি আজীবন কবিতায়, গানে, গদ্যে দেশবাসীকে আবেদন করেছি। সে সব সাহিত্যে স্থান পেয়েছে - সে গান বাঙলার হাটে, ঘাটে, পল্লীতে, নগরে নগরে গীত হয়। আমি হিন্দু-মুসলমান ছাত্র ও তরুণদের সঙ্ঘবদ্ধ করে রেখেছি, যদি

হক মন্ত্রিত্ব ভেঙে যায়, তাহলে আবার coalition ministry- র জন্য। হক সাহেব একদিন বললেন, "কিসের টাকা?" আমি চুপ করে চলে এলাম। তারপর আর তাঁর কাছে যাইনি। আপনি Secretariate - এ যখন বলেছিলেন, "ও হয়ে যাবে", তখন থেকে স্থির বিশ্বাসে বসে রইলাম, "আমি নিশ্চয়ই টাকা পাব।" এই coalition ministry-র একমাত্র আপনাকে আমি অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি — আর কাউকে নয়। আমি জানি, আমরাই এই ভারতবর্ষকে পূর্ণ স্বাধীন করব — সেদিন বাঙালীর আপনাকে ও সুভাষ বসুকেই সকলের আগে মনে পড়বে —আপনারাই হবেন এ দেশের সত্যকার নায়ক।

আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ গ্রহণ করবেন। আমি জানি আমি Hindu-muslim Equity fund থেকে আমার ঋণ-মুক্তির টাকা পাব। আপনার কথা কখনো মিথ্যা হবে না। পাঁচশ টাকা পেয়েছি। আরো পাঁচশ টাকা অনুগ্রহ করে যত শীঘ্র পারেন পাঠিয়ে দেবেন, বা যখন মধুপুরে আসবেন নিয়ে আসবেন। কোর্টের ডিগ্রির টাকা দিতে হবে। তিন চার মাস দিতে পারিনি। তারা হয়তো Body-warant বের করবে। আপনার মহত্ত্ব, আপনার আমার উপর ভালোবাসা, আপনার নির্ভীকতা শৌর্য্য সাহস আমার অণুপরমাণুতে অন্তরে বাহিরে মিশে রইল। আমার আনন্দিত প্রণাম-পদ্ম শ্রীচরণে গ্রহণ করুন। প্রণত

- কাজী নজরুল ইসলাম।

শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুতে একটি শ্রদ্ধাঞ্জলি
SHYAMA PRASAD

A giant has departed..... lo' the sun
Of a colossal intellect has set,
The giants are departing one by one
To whom our mourning nation owes a debt
Incalculable debt that shall be paid
With understanding in the waging strife—
We dare not rest until our hands have made
A mighty structure of our nation's life.
He gave us the impression of a tree
With thoughts about him like to foliage packed—
How often we agreed to disagree
Yet kept our merry friendship all intact,
We laughed and jested, at each other sent
Ironic repartee like arrows hurled
When we discussed affairs of parliament
And several sorry problems of the world.
We saw not eye to eye in many things
And yet we were the very best of friends—
Yes—mighty eagle ! now fold up your wings
Since suddenly your weary journey ends.
How swiftly you have gone out of our reach,
The sudden cancellation of a peak—
Fried ! we shall miss your presence and your speech
Which thundered every time you rose to speak.
How shall our grief in language be expossed
And how shall we forget this mournful day ?
"The jail is an ideal place for rest"
Is what you said before you went away .....
How shall you rest for centuries to come,
High oratory, packed wfth lightning flashes,
Shall, like a secret statue, cold and dumb,
Sit on the monument which hides your ashes.

Harindranath Chattopadhyaya

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়র রহস্যজনক মৃত্যু সম্পর্কে তাঁর পরিবারের তরফ থেকে ৮০ পাতার একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয় (আগস্ট, ১৯৫৩)। পুস্তিকাটি লেখক উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং ভূমিকা লিখেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মাতা যোগমায়া দেবী। দুষ্প্রাপ্য ঐ পুস্তিকাটিতে শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু রহস্যের উপর আলোকপাত করা হয়েছেঃ

....ডঃ মুখার্জী বিনা পারমিটে কাশ্মীরে প্রবেশ করিয়াছিলেন বলিয়াই কাশ্মীর সরকার তাঁহাকে গ্রেপ্তার করেন বলিয়া সাধারণঃ যে ধারণা পোষণ করা হয় তাহা ভ্রান্ত। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, ৮মে ১৯৫৩ তারিখে ডঃ মুখার্জী শেখ আবদুল্লাকে যখন তাঁহার কাশ্মীর পরিদর্শনের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া টেলিগ্রাম করেন, তখন শেখ আবদুল্লা তাঁহাকে জানান যে, বর্তমানে তাঁহার কাশ্মীর আগমন অসময়োচিত হইবে। ডঃ মুখার্জী আটক অবস্থায় এই বিষয়টির প্রতি তাঁহার কৌশুলির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাঁহার ব্রিফ কেসে প্রাপ্ত কাগজে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন যে, শেখ আবদুল্লা ঐ সময়ে তাঁহার কাশ্মীর পরিদর্শনকে বিপজ্জনক মনে করেন নাই, যাহাতে তাঁহাকে জননিরাপত্তা আইনের আমলে আনা যায়। শেখ আবদুল্লা তাঁহার প্রস্তাবিত কাশ্মীর পরিদর্শনকে 'অসময়োচিত' বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন।

.....কাশ্মীর সরকার পারমিট প্রথা প্রবর্তন করেন নাই —উহা প্রবর্তন করিয়াছিলেন ভারত সরকার এবং ভারত সরকারের কর্মচারিগণ ডঃ মুখার্জীকে কাশ্মীরে প্রবেশে বাধা তো দেনই নাই, বরং ১১মে ১৯৫৩ তারিখে গুরুদাসপুরের ডেপুটি কমিশনার 'পারমিট ছাড়া কাশ্মীর প্রবেশে যাহাতে তাঁহার ব্যাঘাত না ঘটে, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য' ভারত সরকারের নির্দেশক্রমে ডঃ মুখার্জীর সহিত মাধোপুর সীমান্ত ঘাঁটিতে যান।

... ডঃ মুখার্জীর সহকর্মী বৈদ্যগুরু দত্ত তাঁহার বিবৃতিতে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, তাঁহারা যাহাতে জম্মু যাইতে পারেন, সেই জন্য উক্ত অফিসার যানবাহনের ব্যবস্থা করিয়া দিতেও চাহিয়াছিলেন। তাঁহার অধীনস্থ একজন কর্মচারী ডঃ মুখার্জীর দলের কয়েকজন ব্যক্তিকে নিজের জীপে করিয়া মাধোপুর সীমান্ত ঘাঁটিতে পৌঁছাইয়া দেন। মাধোপুর ঘাঁটিতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও তাঁহার কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ডঃ মুখার্জীর শুভযাত্রা কামনা করেন। ইহার অল্পক্ষণ পরই ডঃ মুখার্জী কাশ্মীর প্রবেশ করিতেই কঠুয়া (জম্মু) পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট তাঁহাতে গ্রেপ্তার করেন। চীফ সেক্রেটারী ও ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ কর্তৃক স্বাক্ষরিত দুইটি আদেশ পত্র তাঁহার সঙ্গেই ছিল। ১০.৫.৫৩ তারিখের প্রথম আদেশে ডঃ মুখার্জীকে রাজ্যে প্রবেশ না করিতে আদেশ দেওয়া হয় এবং ১৫.৫.৫৩ তারিখের দ্বিতীয় আদেশে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দেওয়া ছিল। প্রথম আদেশটি জারী করার 'এক মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে' দ্বিতীয় আদেশটি জারী করা হয়। গ্রেপ্তারের কারণস্বরূপ যাহা বলা হয়, তাহা হইতেছে 'তিনি এইরূপ কার্য করিয়াছেন, করিতেছেন এবং করিতে উদ্যত হইয়াছেন, যাহাতে জনসাধারণের নিরাপত্তা ও শান্তি বিঘ্নিত হইতে পারে এবং উহা হইতে তাঁহাকে বিরত করার জন্য তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইতেছে। স্পষ্টতই দেখা যায় যে, গ্রেপ্তারের যে কারণ প্রদর্শিত হয়, আদেশপত্র স্বাক্ষরের সময়ে ঐ কারণ বিদ্যমান ছিল না।

....আরও দেখা যায় যে, বিনা পারমিটে কাশ্মীর প্রবেশ তাঁহার গ্রেপ্তারের কারণ ছিল না। ঐ আদেশগুলির সঙ্গেই ডঃ মুখার্জীকে দুই মাসের জন্য শ্রীনগরের সেন্ট্রাল জেলে আটক রাখার জন্য শ্রীনগর সেন্ট্রাল জেলের সুপারিনটেনডেন্টকে নির্দেশ দেওয়া হয়। কাশ্মীরের ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ্ পুলিশ ঐ নির্দেশ স্বাক্ষর করেন। ডঃ মুখার্জীর গ্রেপ্তারের পর কাশ্মীর সরকার একটি অর্ডিনান্স জারী করিয়া কাশ্মীর সরকারের পারমিট ব্যতীত কাশ্মীর প্রবেশ নিষিদ্ধ করেন। কিন্তু ডঃ মুখার্জীকে এই অর্ডিনান্স অনুসারে গ্রেপ্তার করা হয় নাই। তথাপি গ্রেপ্তারের পর শেখ আবদুল্লা তাঁহার বেতার বক্তৃতায় বলেন যে, পারমিট ছাড়া রাজ্যে প্রবেশ করার দরুণই ডঃ মুখার্জীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ডঃ মুখার্জীর মৃত্যুর পরেও শেখ আবদুল্লা ঐ যুক্তিরই পুনরাবৃত্তি করিয়া বলেন যে, 'পারমিট প্রথা আমাদের পক্ষে কিছুটা অসুবিধাজনক হইলেও ভারতের জাতীয় নিরাপত্তার প্রয়োজনে আমাদিগকে উহা মানিয়া লইতে হইয়াছে। কারণ ভারতের নিরাপত্তা রক্ষা করাই প্রত্যেক ভারতীয়ের সর্বপ্রথম কর্তব্য।' সুতরাং কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রীর মতে ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা ও ভারতের আত্মরক্ষার জন্য ডঃ মুখার্জীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

.....ডঃ মুখার্জী কাশ্মীরে গ্রেপ্তার হইবার পূর্বেই তাঁহার বিরুদ্ধে দিল্লিতে একটি মামলা বিচারাধীন ছিল। দিল্লির ম্যাজিস্ট্রেট ডঃ মুখার্জীর জবানবন্দী গ্রহণের জন্য কাশ্মীর সরকারের চীফ সেক্রেটারীকে পত্র লিখিলে, তিনি ডঃ মুখার্জীকে দিল্লি পাঠাইতে অসম্মত হন। ইতিমধ্যে দিল্লির স্থানীয় গভর্ণমেন্ট মামলার শেষ সাক্ষী জনৈক পুলিশ ইন্সপেক্টারের পীড়ার অজুহাতে মামলার শুনানী বিলম্বিত করেন। অতঃপর ডঃ মুখার্জীর আটককাল ১৯৫৩ সালের ১৩ জুলাই শেষ হইবে জানিতে পারিয়া মামলার শুনানী ১৫ জুলাই পর্যন্ত মুলতুবী রাখা হয়। এই প্রসঙ্গে ডঃ মুখার্জীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে শেখ আবদুল্লা যে বিবৃতি দেন তাহা বিশেষ প্রাণিধানযোগ্য। উহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, জওহরলাল নেহরুর ভারতে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই ডঃ মুখার্জীকে দিল্লি পাঠাইবার বিষয় গভর্ণমেন্ট বিবেচনা করিতেছিলেন। ডঃ মুখার্জী ও তাঁহার লিখিত একটি নোটে ভারতীয় কর্মচারীরা যেভাবে তাঁহার কাশ্মীর প্রবেশে সাহায্য করিয়াছিলেন তাহাতে ভারত সরকার ও কাশ্মীর সরকারের মধ্যে একটা ষড়যন্ত্র ছিল বলিয়া উল্লেখ করেন। ১৯৫৩ সালের ১২মে তারিখের পত্রে তিনি লেখেন, "ভারত সরকার যদিও পারমিট ছাড়া কাশ্মীর প্রবেশ বাধা নাই, তথাপি গতকল্য আমাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। অতি অদ্ভুত অবস্থায় আমার শ্রীনগর বাসের ব্যবস্থা হইয়াছে।" জনসাধারণ যে সন্দেহ পোষণ করিতেছে, ডঃ মুখার্জীর নিজের এই মন্তব্যের মধ্যে তাহাই প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

....ডঃ মুখার্জীকে যে বাংলোতে রাখা হইয়াছিল, তাহাতে তিনজনের বেশি লোক থাকা যায় না। ১৯ জুন পন্ডিত প্রেমনাথ ডোগরাকে ঐ গৃহে লইয়া আসিলে তাঁহাকে গৃহের বাহিরে একটি তাঁবুতে জায়গা দিতে হয়। ঐ বাংলোতে

পায়চারী করার মতো যথেষ্ট জায়গা ছিল না। ব্যায়ামের অভাবে ডঃ মুখার্জীর ক্ষুধামান্দ্য ঘটে। ডঃ মুখার্জী কর্তৃক ৩১মে হইতে ১৫ জুন পর্যন্ত লিখিত পাঁচখানি পত্রের প্রত্যেকটি পায়চারী করিবার স্থানের অভাবে ক্ষুধামান্দ্যের কথা তিনি উল্লেখ করেন।

ডঃ মুখার্জীর পীড়া ও সন্তোষজনক চিকিৎসা সম্বন্ধে ডঃ মুখার্জীর পত্র উদ্ধৃত করিয়া কাশ্মীর সরকারের মন্ত্রী যে বিবৃতি দেন, ৬ জুন ১৯৫৩ তারিখে ডঃ মুখার্জী কর্তৃক বাংলায় লিখিত উক্ত পত্রের নিম্নলিখিত অংশ উহা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছিল - "আমার শরীর মোটামুটি ভালই যাইতেছিল, কিন্তু গত দুই দিন যাবৎ পুনরায় পায়ের ব্যথা বৃদ্ধি পাইয়াছে - জানিনা কেন এমন হইতেছে। গত কাল ডাক্তার আসিয়া আমার ঔষধ দেন। তিনি আমাকে সারাদিন উঠিতে নিষেধ করিয়া যান। একেই তো এখানে পায়চারী করিবার পর্যন্ত কোন উপায় নাই, একমাত্র ছোট্ট বাগানের মধ্যে ছাড়া, যাহা দ্বারা আমার একটুও ক্ষুধা হয় না। ইহার উপর যদি আমাকে সম্পূর্ণরূপে শয্যায় আবদ্ধ থাকিতে কিংবা চুপচাপ বসিয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে উহা আমার পক্ষে আরও অসহ্য হইয়া উঠে। এতদ্ব্যতীত সন্ধ্যার দিকে কয়েকদিন যাবৎ আমার জ্বর হইতেছে - বেশি নয় - ৯৯ ডিগ্রি। চোখ ও মুখ জ্বালা করিতেছে। ঔষধ গ্রহণ করিতেছি।"

এই পত্র ১২ জুন পাইবার পর সঙ্গে সঙ্গে ডঃ মুখার্জীর ভাই ডঃ বিধান রায়কে ডঃ মুখার্জীর অসুস্থতার সংবাদ জানান এবং তাঁহাকে কাশ্মীর সরকারের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিতে অনুরোধ করেন। ডাঃ রায়ও উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, তিনি শেখ আবদুল্লার সহিত এই বিষয়ে আলাপ করিবেন। ডঃ মুখার্জীর পুত্রও দিল্লীতে কাশ্মীর যাইবার জন্য পারমিট লাভের চেষ্টা করেন, কিন্তু ব্যর্থ হন।

যে সমস্ত বই ও পত্র-পত্রিকার সাহায্য নেওয়া হয়েছে

০১। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় - পঞ্চাশের মন্বন্তর

০২। Shyamaprasad Mukhopadhyay - Intigrate Kashmir,(speech)

০৩। ঐ Intigrate Kashmir (correspondence)

০৪। ঐ Letters to the Governor

০৫। উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত) - শ্যামাপ্রসাদের ডায়েরী ও মৃত্যু প্রসঙ্গ

০৬। Balaraj Madhok - Portrait of a Martyr

০৭। ঐ -Why Janasangha?

০৮। ঐ -Dr. Shyamaprasad

০৯। রমেশচন্দ্র মজুমদার - বাংলাদেশের ইতিহাস

১০। স্বামী আত্মানন্দ - মনীষীদের দৃষ্টিতে আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দ

১১। V. P. Verma (ed) - Modern Indian Political Thought

১২। Pranab Kumar Chattapadhya - Struggle and Strife in Urban Bengal (1937 - 1947)

১৩। অচিন্ত কুমার সেনগুপ্ত - জ্যৈষ্ঠের ঝড়

১৪। অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় - বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত

১৫। Brig. J. P. Dalvi - Himalayan Blunder

১৬। H. V. Hudson - The Great Divide - Britain, India and Pakistan

১৭। Dr. Shyamaprasad Mookherjee (A Loksabha Publication)

১৮। P. Moon - Divide and Quit

১৯। Historical Studies (Quarterly Review)

২০। Transfer of Power

২১। The Crime of Nathuram Godse

২২। (ক) স্বস্তিকা, (খ) আনন্দবাজার, (গ) যুগান্তর, (ঘ) বর্তমান (সাপ্তাহিক), (ঙ) Amrita Bazar, (চ) Hindustan Standard, (ছ) Indian Annual Register, (জ) প্রবাসী, (ঝ) শনিবারের চিঠি।

অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (পঃ বঃ) প্রকাশিত কয়েকটি বই

১। ওরা শুধু ভুল করে যায় - শান্তনু সিংহ
২। পাকিস্তানের সমর্থনে - শান্তনু সিংহ
৩। সহকর্মীদের চোখে লেনিন - শান্তনু সিংহ
৪। নোয়াখালি নোয়াখালি - শান্তনু সিংহ
৫। ঘুণ ধরেছে মনুষ্যত্বে - বুদ্ধদেব গুহ
৬। মন্ডল কমিশন - সংকলন
৭। নীলকন্ঠ মূকনায়ক - তপন কুমার ঘোষ
৮। মুখোশ ছিঁড়ে - তপন কুমার ঘোষ
৯। Reply to the Vilification of Hindutva - Dr. Ashok Modak
১০। সিধে চোখে লালেশ্বর - শ্রীকাঞ্চন
১১। ছাত্র আন্দোলনে নবদিগন্ত - অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ